অবিস্মরণীয়
মাওলানা ভাসানী

অবিস্মরণীয় মাওলানা ভাসানী

সুকুমার চক্রবর্তী

অবিস্মরণীয় মাওলানা ভাসানী
সুকুমার চক্রবর্তী
প্রকাশকাল * একুশে বইমেলা ২০২৫
প্রকাশনায়: ছায়ানীড়, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল
০১৭০৬-১৬২৩৭১, ০১৭০৬-১৬২৩৭২
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রুফ এডিটিং: আজমিনা আক্তার
প্রচ্ছদ: তারুণ্য তাওহীদ
অলঙ্করণ : মো. শরিফুল ইসলাম
ছায়ানীড় কম্পিউটার বিভাগ
মুদ্রণ ও বাঁধাই : দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
শুভেচ্ছা মূল্য * ৩০০/- (তিনশত) টাকা
আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৯৯৮০৬-১-২
ISBN : 978-984-99806-1-2
Obisshoronio Maulana Vasani by Sukumar Chakraborti. Published by Chayyanir. Shantikunja More, BSCIC Road, Thanapara, Tangail, 1900. Date of Publication: Ekushey Book Fair-2025. Copy Right: Writer, Cover design: Tarunnya Tauhid; Edit: Ajmina Akter; Book Setup: Md. Shariful Islam. Chayyanir Computer. Price: TK. 300/- (Three Hundred Only).
ঘরে বসে যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন–http://rokomari.com
ফোনে অর্ডার : ০১৬১১-৯১৩২১৪

উৎসর্গ

শিক্ষাগুরু
প্রপিতামহ: স্বর্গীয় ঈশ্বর চন্দ্র চক্রবর্তী
পিতামহ: স্বর্গীয় শরৎ চন্দ্র চক্রবর্তী
পিতা: স্বর্গীয় কুমুদ চন্দ্র চক্রবর্তী
মাতা: স্বর্গীয়া লাবণ্য প্রভা দেবী
যাঁদের আশীর্বাদ ধন্য হয়ে আমি এই মধুময় পৃথিবীর আলো দেখেছি,
শিক্ষা লাভ করেছি
এবং আমার ক্ষীণতম চৈতন্যোদয় হয়েছে
তাঁদের অমৃতময় স্মৃতির উদ্দেশ্যে এ গ্রন্থখানি নিবেদন করছি।

ভূমিকা

মাওলানা ভাসানীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে আমি যখন ভাসানী প্রতিষ্ঠিত টাঙ্গাইলের কাগমারীর মাওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজে বাণিজ্য বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করি। আমার বয়স তখন বেশ কম ছিলো। কলেজের প্রিন্সিপাল জলিল সাহেব আমাকে মাওলানা ভাসানীর কাছে নিয়ে যান প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ দেবার অনুমোদনের জন্য। ভাসানী সাহেব আমাকে দেখে মন্তব্য করেন- 'এতো একেবারে চ্যাংরা, সাতদিন ক্লাস নেবার পরে আমার কাছে নিয়ে এসো; তখন তার সাথে কথা বলে নিয়োগ পাকা করা যাবে।' সাতদিন পরে যখন তাঁর কাছে গেলাম, তিনি প্রথমেই আমাকে বললেন, 'তুমি নাকি ইংরেজিতে ক্লাস নাও।' প্রিন্সিপালকে বললেন, 'তোমার এই নাবালক প্রফেসর তো ভালই নাম করেছে; এর নিয়োগ পাকা করলাম।'

এরপরে যতবার তাঁর সন্তোষ দরবার হলে দেখা করতে গিয়েছি তিনি নিজের হাতে ফল কেটে আমাকে খাইয়েছেন। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। মাওলানা ভাসানীর কলেজে চাকরি করার সময় আমি স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানে চাকরির জন্য পরীক্ষা দেই এবং চাকরি হয়ে যায়। কিন্তু কলেজে আমাকে ছাড়তে চায় না। তখন আমি মাওলানা ভাসানীর কাছে যাই স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের নিয়োগপত্র নিয়ে। তিনি স্টেট ব্যাংকের নিয়োগপত্র দেখে খুব খুশী হন প্রিন্সিপালকে ডেকে আমাকে ছাড়পত্র দিতে বলেন এবং আমার বকেয়া বেতন মিটিয়ে দিতে বলেন। আমার আর কোনো সমস্যাই রইলো না।

এরপর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানি সেনারা ভাসানীর সন্তোষের বাড়িতে আগুন দেয় কিন্তু তাঁকে ধরতে পারেনি। তিনি ছদ্মবেশে সন্তোষ ত্যাগ করেন এবং পাটের নৌকায় আসাম চলে যান। সেখানে ভারত সরকার তাকে আশ্রয় দেন এবং মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করে বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ মাওলানা ভাসানীকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন এবং সংকটকালে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

আমি এম. কম. পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে বসে আছি। একদিন বিকেলে কাগমারীর ভাসানী কলেজের প্রিন্সিপাল জলিল সাহেব সাইকেলে চড়ে আমাদের বাসায় এলেন। বাবা তাঁকে সম্মান করে বসালেন। প্রিন্সিপাল সাহেব বাবাকে বললেন, 'আমাদের কলেজে কমার্স-এর প্রফেসার নাই, শুনলাম আপনার ছেলে এম. কম. পরীক্ষা দিয়ে এসে বসে আছে। সে তো ইউনিভার্সিটির স্টান্ড করা ছাত্র, আই. কম-এর ছাত্রদের পড়াতে পারবে, তাকে প্রফেসার হিসাবে নিয়োগ দিতে চাই। এখন বেতন মাসে ১৭৫টাকা, এম. কম. পাশ করলে ২০০ টাকা।' বাবা বললেন, 'খুবই আনন্দের বিষয়। সুকুমার তাহলে কাল থেকেই কাজ শুরু করুক।' জলিল সাহেব বললেন, 'কথা ফাইনাল, সুকুমার তুমি কালই কলেজে যোগ দাও।' এই বলে তিনি সালাম বিনিময় করে বিদায় নিলেন।

মা তখন বললো, 'দেখ ভগবানের কি লীলা ছেলে স্কলারশিপ পেয়ে করাচীতে এমবিএ পড়তে যেতে পারে নাই বাপে হাসপাতালে ছিল বলে, এখন দেখ ভগবানের আশীর্বাদে ঘরে বসে চাকরি হয়ে গেল।'

পরদিন সকালে স্নান খাওয়া দাওয়া করে একটা সাইকেল ভাড়া করে কলেজে গিয়ে প্রিন্সিপাল সাহেবের কাছে গেলাম। তিনি আমার জন্য নিয়োগ পত্র ও যোগদান পত্র টাইপ করে রেখেছিলেন, আমাকে দিলেন সই করার জন্য। সই করতে গিয়ে দেখি কলেজের নাম এম. এম. আলী কলেজ। আমি প্রিন্সিপাল সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, স্যার এম. এম. আলী কে? তিনি বললেন, মাওলানা ভাসানী তাঁর ধর্মীয় নেতা মাওলানা মোহাম্মদ আলীর নামে কলেজ করেছেন। তবে সাধারণ লোকে এই কলেজকে ভাসানী কলেজ বলেই জানে কারণ এই কলেজের সবকিছু মাওলানা ভাসানী করেছে।

প্রথম দিনই বিকেলে ক্লাস শেষে প্রিন্সিপাল সাহেব আমাকে ও অন্য তিন জন প্রফেসর সহযোগে সন্তোষে মাওলানা ভাসানীর দরবার গৃহে গিয়ে হাজির হলেন এবং মাওলানা সাহেবকে আমাদের উপস্থিতির খবর পাঠালেন। কিছু সময় পরে মাওলানা সাহেব বাড়ির ভিতর থেকে দরবার ঘরে এলে আমরা সবাই তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি সালাম গ্রহণ করে আমাদের বসতে বললেন এবং নিজেও শতরঞ্জের উপর তাঁর আসনে বসলেন। আমরা সবাই শতরঞ্জের উপর বসলাম। প্রিন্সিপাল সাহেব বললেন, 'হুজুর আজ কমার্স-এর একজন প্রফেসার পাওয়া গেছে, তাকে নিয়ে এসেছি আপনার সাথে পরিচয়

করিয়ে দিতে। এর নাম সুকুমার চক্রবর্তী, এম. কম. পরীক্ষা দিয়ে এসেছে। এনার পিতা কুমুদ চন্দ্র চক্রবর্তী, টাঙ্গাইলের বিবেকানন্দ হাই স্কুলের শিক্ষক।' মাওলানা সাহেব আমার পরিচয় পেয়ে বললেন, 'শিক্ষকের ছেলে তাহলে তো ভালোই হবে মনে হয়। তবে একেবারে চ্যাংড়া মানুষ ছাত্ররা মানবে তো। মাস খানিক ক্লাস নিতে দাও যদি ছাত্ররা মানে তাহলে পাকাপাকি নিয়ে নিও।' আমকে বললেন, 'কি ঠাকুর ক্লাস নিতে পারবে তো ? আমি বললাম আপনার দোয়া থাকলে কোনো অসুবিধা হবে না।' আমার কথা শুনে তিনি প্রিন্সিপাল সাহেবকে বললেন, 'এই ছেলের তো সাহস আছে। এক সপ্তাহ পরে আবার আমার কাছে নিয়া আসবা আর ছাত্ররা কি বলে তাও জানাইবা।' কথাবার্তা বলতে বলতে তিনি কাজের লোক ডেকে আমাদের সবাইকে আম কেটে দিতে বললেন। আম খেতে খেতে তিনি প্রিন্সিপাল সাহেবকে বললেন, 'সুকুমারের চেহারা ছবি তো বেশ ভালো তবে ধূতি পইরা ক্লাস নিতে পারবো তো, আমার কোনো আপত্তি নাই, ছাত্ররা মানলেই হয়।' প্রিন্সিপাল সাহেব বললেন, হুজুর আমরা এক সপ্তাহ দেখি, তারপর আপনার কাছে নিয়ে এসে সব জানাবো।' আম খেয়ে আমরা সবাই মাওলানা সাহেবকে সালাম জানিয়ে বিদায় নিলাম। যেতে যেতে আমি প্রিন্সিপাল সাহেবকে বললাম, 'স্যার বসাকবাবু তো ধূতি পড়েই ক্লাস নিচ্ছেন।' প্রিন্সিপাল সাহেব বললেন, 'সে ঠিক আছে তবে আপনার আগের প্রফেসর প্যান্ট শার্ট পড়ে খুব কেতাদুরস্ত হয়ে ক্লাস নিতেন তাই একটু চিন্তা হচ্ছে, দেখা যাক কি হয়।'

বাড়ি ফিরে জলখাবার খেয়ে বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে বাজারে গিয়ে জুতা মোজা ধূতি কিনে নিয়ে এলাম। পরের দিন সকালে স্নান খাওয়া দাওয়া সেরে নতুন ফকফকে ধূতি শার্ট নতুন ব্রাউন পাম্পসু জুতা সাদা মোজা পরে ফিটবাবু সেজে কলেজে গিয়ে প্রিন্সিপাল সাহেবকে সালাম দিলাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পোশাক তো খুব ভালো হয়েছে এখন ক্লাসটা ভালো হলেই হয়।'

আমি ইংরেজিতে ক্লাস নিতে শুরু করলাম। কারণ বই সব ইংরেজিতে লেখা পরীক্ষাও ইংরেজিতে হবে সুতরাং ইংরেজিতে না পড়ালে ছাত্রদের অসুবিধা হবে। ছাত্ররা ধীরে ধীরে বুঝতে শুরু করলো। চতুর্থ দিন লাঞ্চ-এর সময় সেকেন্ড ইয়ারের চারজন ছাত্র আমার কাছে এসে বললো তারা একাউন্টিং-এ প্রাইভেট পড়তে চায় ছুটির পরে ক্লাসরুমে। আমি বললাম, 'প্রিন্সিপাল সাহেব অনুমতি দিলে কাল থেকে পড়াবো। তোমরা ৫০টাকা করে নিয়ে এসো কাল। ওরা খুশি হয়ে চলে গেল। আমি প্রিন্সিপাল সাহেবের কাছে অনুমতি নিতে গেলাম। শুনে তিনি খুশি হয়ে অনুমতি দিলেন এবং বললেন মাওলানা সাহেবও শুনে খুশি হবেন।

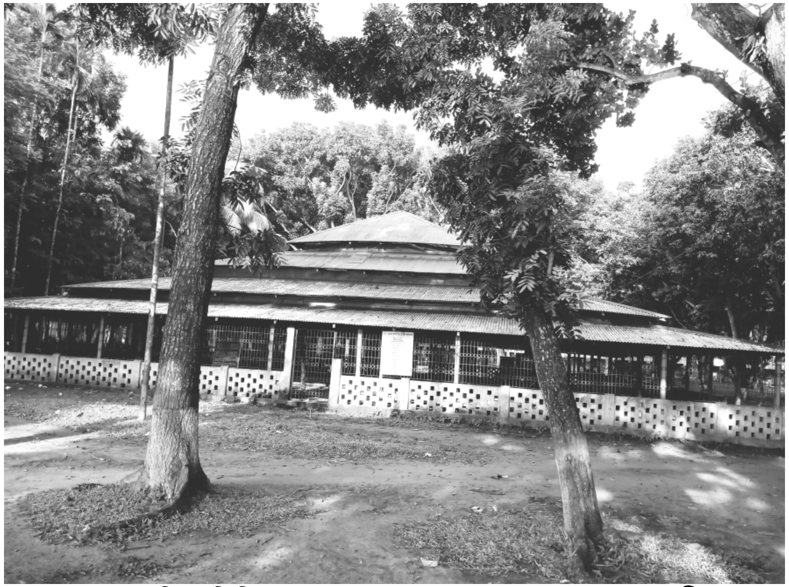

সপ্তাহের শেষ দিন প্রিন্সিপাল সাহেব আমাদেরকে মাওলানা ভাসানীর কাছে নিয়ে গেলেন। খবর পেয়ে মাওলানা সাহেব বেরিয়ে এলেন, আমরা সবাই তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি আমাদের বসতে বলে নিজেও তাঁর আসনে বসলেন। প্রিন্সিপাল সাহেব তখন মাওলানা সাহেবকে বললেন, 'সুকুমারের কাছে ছাত্ররা প্রাইভেট পড়তে শুরু করেছে। সে এই সাতদিনে বেশ ভালোই নাম করেছে।' সব শুনে ভাসানী বললেন, 'ওকে দেখেই আমার একটা ভালো ধারণা হয়েছিল। আজ তো সুকুমারের চেহারা চকচক করছে, তার অর্থ হলো এ কাজে সে খুব আনন্দ পাচ্ছে। যাক তাহলে তোমার সমস্যা মিটলো।' এর মধ্যে কাজের লোক আমাদের সবাইকে প্লেটে করে আম দিয়ে গেল। আমরা আম খাচ্ছি তখন ভাসানী বললেন, 'আমি খবর পাইলাম নতুন প্রফেসর নাকি ইংরেজিতে পড়ায়, তাতে দেখলাম ছাত্রদের কোনো আপত্তি নাই। বেশ বেশ, আমি তো এই রকমই চাই।' এরপর আমরা তাঁকে সালাম জানিয়ে বিদায় নিলাম।

কিছুদিন পরে আমার সহপাঠী রঞ্জিতের বাসায় গিয়ে জানতে পারলাম, স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান কর্মকর্তা নিয়োগের পরীক্ষা নেবে। রঞ্জিত আমাকে একটা দরখাস্তের ফরম দিল। আমি ফরম পূরণ করে পাঠিয়ে দিলাম। দুই

সপ্তাহ পরে স্টেট ব্যাংক পরীক্ষা দেওয়ার কার্ড পাঠালো। আমি পরীক্ষা দিয়ে এলাম। পরীক্ষার হলে আমার এক সহপাঠীর সঙ্গে দেখা। সে আমাকে পরীক্ষার ফল জানাবে বললো, প্রায় তিন সপ্তাহ পরে ঐ সহপাঠীর পোস্ট কার্ড পেলাম। সুসংবাদ, পরীক্ষায় আমি প্রথম হয়েছি এবং আমাদের ট্রেনিং শুরু হবে ১৩ই ডিসেম্বর। এক সপ্তাহ পরে স্টেট ব্যাংকের চিঠি পেলাম, এক বছরের ট্রেনিং-ছয়মাস ইনস্টিটিউটে ট্রেনিং তারপর পরীক্ষা, পাস করলে চাকরি, আরও ছয়মাস প্র্যাকটিকাল ট্রেনিং। প্রথম ছয়মাস ১৫০টাকা মাসে এবং পরের ছয়মাস ২০০টাকা করে এলাউন্স। আমি তখন কলেজের বেতন ও প্রাইভেট পড়িয়ে মাসে ৮০০টাকা পাই। আমি বাবাকে বললাম, এই চাকরিতে গিয়ে কোনো লাভ নাই। বাবা বললেন, 'আমরা চার পুরুষ হয় শিক্ষকতা করছি কোনো উন্নতি নাই। সংসার চলে জমি বিক্রি করে। ব্যাংকের চাকরিতে ভবিষ্যতে অনেক উন্নতি হবে, তুমি ব্যাংকেই যোগ দাও।' পরদিন ব্যাংকের চিঠি নিয়ে প্রিন্সিপাল সাহেবের সাথে দেখা করলাম। চিঠি পড়ে তিনি তো অবাক, বললেন, '১৫০টাকায় তো ঢাকায় থাকা খাওয়াতেই ফুরিয়ে যাবে। আপনার বাবাকে কি দেবেন? বাবাকে গিয়ে বুঝান।' বাড়িতে গিয়ে এসব কথা বললাম। বাবা বললেন, 'ব্যাংকের চাকরি লোকে সাধ্য সাধনা করে পায় না, আর তুমি হাতে পেয়ে পায়ে ঠেলবে, তা একদম ঠিক হবে না। তুমি কাল মাওলানা সাহেবের কাছে গিয়ে ব্যাংকের চিঠি আর তোমার বন্ধুর পোস্ট কার্ড দেখাবে, তাহলে দেখবে ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

পর্ব ২

বাবার কথামত পরের দিন ক্লাসের ফাঁকে আমি মাওলানা সাহেবের সাথে দেখা করে স্টেট ব্যাংকের চিঠি ও আমার বন্ধুর লেখা পোস্ট কার্ড তাঁর হাতে দিলাম। তিনি পোস্ট কার্ডটা নিজে পড়ে অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি পরীক্ষায় ফার্স্ট হইছো তাইতো স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান তোমারে চাকরি দিছে। ওরা তো পূর্ব পাকিস্তানের লোকদের চাকরি দিতে চায় না। তার মধ্যে তুমি আবার হিন্দু। সাবাস, তুমি আমাদের কলেজের সুনাম করছো, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। এখন তো তোমাকে আমাদের ছাড়তে হবে, তা আর কি করা যাবে, তোমার এত বড় একটা সুসংবাদ, আমাদের কিছুটা ক্ষতি হলেও তা করতে হবে। তোমার কি কথা শুনি।' আমি বললাম, হুজুর আমার ৪০০টাকা বেতন বাকী পড়েছে। টাকাটা পেলে আমি বাবাকে কিছু দিয়ে ঢাকায় আমার এক মাসের খরচের টাকা নিয়ে যাব, কারণ ব্যাংক তো মাস শেষ হলে বেতন দেবে।' মাওলানা সাহেব ব্যাপারটা বুঝে প্রিন্সিপালকে ডেকে পাঠালেন। তিনি এলে মাওলানা সাহেব বললেন, 'আমাদের কলেজের একজন প্রফেসর স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানে চাকরি পেয়েছে এটা তো কলেজের জন্য গৌরবের কথা। আমার তো খুব আনন্দ হচ্ছে। আপনি আজই ওর বকেয়া বেতন শোধ করে ছাড়পত্র দিয়ে দিবেন এটাই আমার নির্দেশ।' তখন প্রিন্সিপাল সাহেব বললেন, 'হুজুর ফান্ডে সামান্য টাকা আছে, যা আছে দিয়ে দেব, ছাড়পত্রও দিয়ে দেব, তবে আই. কম. ফাইনাল পরীক্ষা সামনে। খুব দ্রুতই একজন প্রফেসর নিয়োগ দিতে

হবে।' আমি বললাম, 'আমার সাথে এম. কম. পাস করেছে এরকম দুজন বসে আছে, আমি তাদের কালই আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব।' আমি মাওলানা সাহেবকে বিকেলে ক্লাসের পরে আবার আসবো বলে সালাম দিয়ে তখনকার মতো বিদায় নিলাম।

কলেজে গিয়ে দুটো ক্লাস নিয়ে ছাত্রদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। ছাত্ররা মনে হয় অফিস থেকে খবর পেয়েছে, ক্লাসের শেষে তারা ফুলের তোড়া দিয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে আমাকে বিদায় জানালো।

ছাত্রদের নিকট বিদায় নিয়ে আমি অফিসে গেলাম, সেখানে কেরানী আমাকে ২০০ টাকা দিল এবং প্রিন্সিপাল সাহেবের সাথে দেখা করতে বললো। আমি কেরানীকে বললাম, '৪০০ টাকা বাকী আর টাকা দিবেন না?' কেরানী বললো, এখন আর টাকা নাই, প্রিন্সিপাল সাহেব আপনাকে বলবেন।'

আমি প্রফেসরদের সাথে দেখা করে শুভেচ্ছা বিনিময় করে বিদায় নিলাম। তারপর প্রিন্সিপাল সাহেবের কাছে গেলাম। তিনি বললেন, 'চলেন মাওলানা সাহেবের কাছে যাই, ওখানেই সব কথা হবে।'

আমরা মাওলানা সাহেবের দরবারে গিয়ে খবর দিলে তিনি বেরিয়ে এলেন। আমরা তাঁকে সালাম দিলাম, তিনি সালাম গ্রহণ করে আমাদের বসতে বলে নিজে তাঁর আসনে বসলেন। প্রিন্সিপাল সাহেব তাঁকে বললেন যে, 'আজ ২০০ টাকার বেশি দেয়া গেল না, বাকী টাকা সাতদিন পরে দিয়ে দেব। ছাড়পত্র সই করে নিয়ে এসেছি আপনি ওকে দিয়ে দিন।' ছাড়পত্র হাতে নিয়ে মাওলানা সাহেব কাজের লোককে পাকা পেঁপে, ছুরি ও প্লেট নিয়ে আসতে বললেন। পেঁপে এলে তিনি নিজের হাতে কেটে দুটি ফালি একটা প্লেটে করে

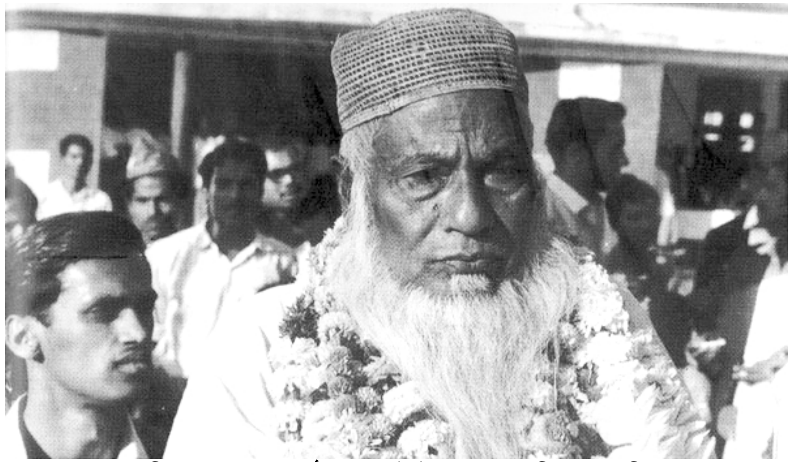

আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'ঠাকুর এটাই তোমার বিদায় অভিনন্দন, আর এই নাও তোমার ছাড়পত্র।' পেঁপে খেয়ে আমি ছাড়পত্র হাতে নিয়ে মাওলানা সাহেবের কাছে গিয়ে সালাম দিয়ে বললাম, 'হুজুর আমার মাথায় হাত রেখে দোয়া করে দেন যেন চাকরিতে উন্নতি করতে পারি।' আমার কথায় তিনি উঠে দাঁড়িয়ে আমার মাথায় হাত রেখে দোয়া করে বললেন, 'তুই অনেক বড় হবি।'

এরপর ৭১' এ আবার তাঁর খুব কাছে আসার সুযোগ হয়েছিল। আমরা তখন মিলিটারির ভয়ে টাঙ্গাইল শহরের বাড়ি ছেড়ে দাইন্যাতে মাওলানা সাহেবের গ্রামের বাড়ির পাশের গ্রামে থাকি। এপ্রিলের প্রথম দিকে পাক বাহিনী মাওলানা সাহেবের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। মাওলানা সাহেব বাড়ি ছেড়ে ধলেশ্বরী নদীর দিকে রওনা হন। তখন দাইন্যাতে আমরা যে বাড়িতে থাকি সেই বাড়ির উঠানের উপর দিয়ে মাওলানা সাহেব যাচ্ছিলেন সেখানে আমার মাসতুতো ছোটবোন লিলির সাথে তাঁর দেখা হয়। লিলির তখন মাত্র সাত বছর বয়স। লিলির বাচনিক শুনুন:

এক দুপুর বেলা উঠোনে ধান ছড়ানো। এমন সময় সবাই দেখলো ধোঁয়া, আগুন ধরিয়ে দিয়েছে বিন্নাফৈর মওলানা আবদুল হামিদ খানের বাসায়। আমাদের বাড়িতে যারা ছিলেন তারা কেউ পাট ক্ষেতে, কেউ ধান ক্ষেতে, পালিয়েছেন। চুনুদা, বুড়াদা, মাসিমা আরও অনেকে ছিলেন।। মা আমাকে, মাসিমা, দিদিকে নিয়ে পাট ক্ষেতে যায়। চুপ করে আমি বের হয়ে এসে তেঁতুল তলায় গিয়ে ঢিল দিয়ে তেঁতুল পাড়তে থাকি। এই সময় এক লোক

লুঙ্গি পরা, মাথায় গামছা, গায়ে হাতওয়ালা গেঞ্জি, হাতে কাঁচি আমাকে ডাকেন 'এই খুকি এদিকে আসো।' আমি কাছে গেলাম। বললেন, 'উঠানে ধান, বাড়ির মানুষ কই?' আমি বললাম, 'সবাই পালিয়েছে', উনি বললেন 'তুমি পালাওনি, ভয় পাওনা তুমি?' আমি বললাম, 'আমার ভালো লাগছিলো না তাই চলে এসেছি।' আমার মাথায় হাত দিয়ে এক গাল হেসে বললেন, 'খুকি তোমার অনেক সাহস। আমি ভাসানী আমার বাড়িতেই আগুন দিয়েছে, ওরা যখন আগুন দেয় আমি ঘরে ছিলাম, বাড়ির চাকরের ছদ্মবেশে ওদের সামনে দিয়ে চলে এসেছি আমারও সাহস আছে কি বলো?' ঠিক এই সময় ধান ক্ষেতের ভিতর থেকে নড়ছিলো, উনি বললেন, 'কে? বের হয়ে এসো, কাঁপতে কাঁপতে ধান ক্ষেত থেকে বের হয়ে এলেন চুনুদা।' ভাসানী সাহেব বললেন, 'এতো ভয় পেলে প্রতিদিন বেঁচে থেকেও মরতে হয়।' ধান ক্ষেতের আল দিয়ে বড় বড় পা ফেলে নেতা চলে গেলেন। যেতে যেতে তিনি বলে গেলেন, 'তোরা হিন্দুরা যদি বাঁচতে চাস তাহলে আমার পিছে পিছে নৌকা ভাড়া করে ইন্ডিয়ায় চলে আয়। আমার বাড়িতে যখন আগুন দিছে তখন তোদের বাড়িঘর সব জ্বালাইয়া দিবো। তোরা আর এখানে থাকিস না।' তাঁর এই কথা থেকে বোঝা যায় তিনি কতটা অসাম্প্রদায়িক ছিলেন।

পর্ব ৩

একাত্তরের এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী মাওলানা ভাসানীর সন্তোষের বিন্নাফৈর গ্রামের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় তখন তিনি বাড়ির ভিতরেই ছিলেন। কামলার ছদ্মবেশে কোমরে গামছা বেধে হাতে কাস্তে নিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের দৃষ্টি এড়িয়ে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন এবং সড়ক পথে না গিয়ে বিভিন্ন বাড়ির উপর দিয়ে নদীর দিকে রওনা হন। সেই সময় আমরা মাওলানা সাহেবের বাড়ির পাশের গ্রাম দাইন্যাতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। আমরা যে বাড়িতে ছিলাম তিনি সেই বাড়ির উপর দিয়ে যাওয়ার সময় আমাদেরকে ইন্ডিয়া চলে যেতে বলেন। কারণ পাকিস্তানিরা হিন্দুদের বাড়ি ঘর সব জ্বালিয়ে দিবে, দেশ হিন্দুশূন্য করবে।

তিনি লম্বা লম্বা পা ফেলে চরের উপর দিয়ে চলতে চলতে দুর্গাপুর চরে তাঁর মুরীদ মাওলানা হেমায়েতউদ্দীনের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। হুজুরকে দেখে তো হেমায়েত সাহেব অস্থির, কোথায় বসাবে কি খাওয়াবে, হুজুর তো এবার খবর দিয়ে আসেন নাই। যাহোক তিনি বেগম সাহেবাকে ডেকে হুজুরের বসার আসন পেতে হাত পা ধোয়ার ব্যবস্থা করে নাস্তা দিতে বললেন। নিজে হুজুরের সঙ্গে সঙ্গে থেকে কথাবার্তা বলতে লাগলেন।

মাওলানা নাস্তা খেতে খেতে মুরীদকে ডেকে বললেন, 'হেমায়েত শোনো পাকিস্তানি মিলিটারি আইজ সকালে আমার বাড়িতে আগুন লাগাইয়া দিছে।

আমি কোনো রকমে ওদের চোখে ধুলা দিয়া তোমার এখানে আসছি। কালই আমি সিরাজগঞ্জ যাব, তুমি নৌকা ঠিক কর।' হুজুরের কথা শুনে হেমায়েত বললো, বলেন কী হুজুর পাকিস্তানি মিলিটারির এত দুঃসাহস যে তারা আপনার বাড়িতে আগুন দেয়, ওরা জানে না যে আপনি পাকিস্তানের স্তম্ভ। আপনার বাড়িতে আগুন দেওয়া মানে সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানের গায়ে আগুন দেওয়া। আমরা আপনের মুরীদেরা কি বইসা থাকুম, সমস্ত পাকিদের জ্বালাইয়া পোরাইয়া মারুম, পাকিস্তানি মিলিটারির নিস্তার নাই, আমরা বিচ্ছুগুলার লগে যোগ দিয়া পাকিদের শেষ করুম ইনশাল্লাহ্।

ভাসানী বললেন, ঠিক আছে, এখন তুমি বাজারের দিকে যাও। সবাইকে বল, সতর্ক থাকতে। নতুন অচেনা লোক দেখামাত্র আমার কাছে নিয়ে আসতে, পাকিস্তানের চর কিনা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। তুমি বাজার থেকে আমার জন্য এক জোড়া করে ফতুয়া, লুঙ্গি, গেঞ্জি ও চপ্পল নিয়ে আসবে। সিরাজগঞ্জে গেলে লাগবে।

তারপর হুজুর মুরিদের বৌকে একটা বিছানা পেতে দিতে বললেন, একটু বিশ্রাম করে নেই, খুব পরিশ্রম হইছে। বিছানা পাতা হলে ভাসানী শুয়ে পড়লেন এবং ঘুমিয়ে গেলেন।

ঘুম ভাংলে ভাসানী দেখেন উঠান ভর্তি মানুষ। একটা লোককে গাছের সাথে বেধে রেখেছে। মানুষগুলোর বেশির ভাগ তাঁর মুরিদ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার ওই লোকটাকে বেঁধে রেখেছো কেন? হেমায়েত মাওলানা এগিয়ে এসে বললো, এই লোকটা আমাদের গাঁয়ের না, কেউ তারে চিনে না।' আমাদের সন্দেহ সে পাকিস্তানের চর। ভাসানী বললেন, আমি গোসল খাওয়া দাওয়া সাইরা এর বিচার করমু।' তোমরা সবাই যার যার বাড়িতে যাও, আমি ডাকলে আইসো।

হুজুর গোসল করে এসে খেতে বসলেন। হুজুর যা যা পছন্দ করেন তাই রান্না করা হয়েছে, তিনি খুব তৃপ্তি করে খেলেন। তারপর তিনি লোকটাকে নিয়ে সরে পড়লেন। তিনি লোকটাকে তিনটি প্রশ্ন করলেন।

নাম কি ?

বাড়ি কোথায়?

এই গ্রামে কেন আইছো ?

কিন্তু কোনো উত্তর নাই, লোকটা কোনো কথাই বলছে না। তখন ভাসানী বললেন, 'একে মারধোর করার দরকার নাই, হাত পাও বাইন্ধা মাঝ নদীতে ফালাইয়া দিয়া আয়।'

যখন লোকটার হাত পাও শক্ত করে বাঁধা শুরু করেছে তখন হাউ মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে ভাসানীর পায়ের উপর পড়ে বলতে শুরু করলো- কইতাছি, কইতাছি, সব কইতাছি।

আমার নাম কাদের

বাড়ি দেলদুয়ার

এই গ্রামে আইছি মাওলানা ভাসানীর খোঁজে

আমি সরকারি চাকরি করি।

সব শুনে ভাসানী বললেন, 'একে মারাও যাবে না, ছাড়াও যাবে না। একে গোপন জায়গায় বন্দী করে রাখ, আমি এখান থেকে যাওয়ার দশদিন পরে এরে ছাইড়া দিস।' এখন এরে নিয়া যা।

পরে ভাসানী মুরিদদের সাথে পরামর্শ করতে বসলেন। ঠিক হলো কাল সকালে হুজুর নৌকাযোগে সিরাজগঞ্জ রওনা হবেন সঙ্গে দুইজন মুরিদ যাবে , তারা হুজুরকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসবে।

পরদিন সকালে দুই মুরিদসহ ভাসানী নৌকায় সিরাজগঞ্জের পথে রওনা হলেন। যাওয়ার আগে হেমায়েত মাওলানাকে কাছে ডেকে সরকারি চরটার ব্যাপারে সাবধান হতে বললেন। যমুনায় এখন পানি বাড়ছে, মাঝ নদীতে পানির গভীরতা অনেক বেশি। বাতাসে ঢেউয়ের দোলায় নৌকা দুলতে লাগলো। ভাসানী মাঝিকে শক্ত হাতে হাল ধরতে বললেন। মাঝি বললো আমরা রোজ রোজ যাতায়াত করতেছি কোনো ভয় নাই। বেলা তিনটায় নৌকা সিরাজগঞ্জ ঘাটে গিয়া ভিরল। ভাসানী মুরিদদের বললেন, 'আমার সঙ্গে

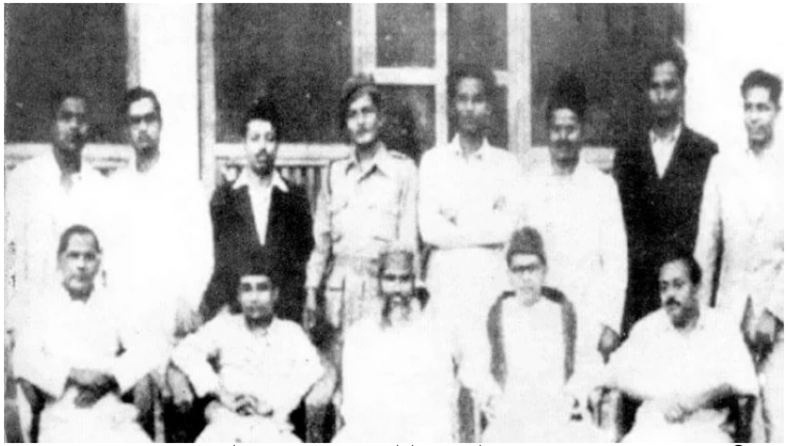

আর আসার দরকার নাই।' তোমরা ঘাটেই হোটেলে খাওয়া দাওয়া করে ফিরে যাও। আমি এখানে এক মুরিদের বাসায় থাকবো। সেখানে চললাম, দোয়া করি তোমরা নিরাপদে ফিরা যাও। সালাম আদায় করে ভাসানী রওনা হলেন। তিনি সিরাজগঞ্জ শহরের ধনী ব্যবসায়ী জামাল হাজীর বাড়িতে উঠলেন। হাজী সাহেব হুজুরকে দেখে ব্যস্ত হয়ে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেলেন এবং বসার ঘরে সবচেয়ে ভালো আসনে বসালেন। বাড়ির সবাই একে একে এসে হুজুরকে সালাম করে দাঁড়ালেন। হাজী সাহেব ছেলেকে বললেন নতুন তোয়ালে ও সাবান নিয়ে সবচেয়ে ভালো বাথরুমে হুজুরের হাত পা ধুয়ে দাও আর বেগমকে বললেন, 'তাড়াতাড়ি সরবত ও নাস্তা নিয়ে আসার জন্য।'

নাস্তা খেতে খেতে মাওলানা তার মুরিদ জামাল হাজীকে বললেন, 'শোন জামাল পাকিস্তানি মিলিটারি গতকাল সকালে আমার বাড়িতে আগুন দিছে, আমি কোনোক্রমে ওদের দৃষ্টি এড়াইয়া কাল দুর্গাপুর চরে এক মুরিদের বাড়িতে ছিলাম আর আইজ তোমার এখানে আইলাম।' এখান থিকা আমি আসাম যামু, সেই ব্যবস্থা তোমার করন লাগবো। হাজী সাহেব বললেন, 'সে ব্যবস্থা করা যাবে, আপনি এখন বিশ্রাম করেন।'

রাতের খাওয়ার সময় হুজুর সবাইকে সাবধান করে বললেন, 'এই বছরটা আমাদের জন্য খুব খারাপ যাবো তোমাদের খুব সতর্ক হইয়া চলন লাগবো। পাকিস্তানি মিলিটারি আমার বাড়িতে আগুন দিছে, আমারে হাতে পাইলে কি করবো বুঝতে অসুবিধা হয় না।' তাই আমি তাজউদ্দীনের কাছে যাইতেছি তাঁকে বুদ্ধি পরামর্শ দিয়া যুদ্ধে সহযোগিতা করতে। জামাল তুমি কালই আমার আসাম যাওয়ার জন্য নৌকা ঠিক করবা। জামাল সাহেব বললেন, নৌকা ভাড়া করার জন্য লোক লাগানো হয়েছে।' খাওয়ার পর আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমান, কালই আপনি রওনা হতে পারবেন। খাওয়ার পর হাত মুখ ধুয়ে হুজুর শুতে গেলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লেন।

পরদিন হুজুর ফজরের নামাজ পড়ে চা খেয়ে হাটতে বেরুলেন। ওনার উদ্দেশ্য পাটের নৌকা যেগুলো আসাম যায় তার খোঁজ খবর করা। ঘাটে গিয়ে তিনি খোঁজ করছেন কোনো পরিচিত মাঝি পাওয়া যায় কিনা। দুই এক জনের সাথে কথা বলছেন, এমন সময় এক লোক দূর থেকে তাঁকে সালাম দিতে দিতে কাছে এসে একেবারে হাউ মাউ করে বলে উঠলো, হুজুর আপনি না টাঙ্গাইলে ছিলেন এখানে কীভাবে এলেন ? হুজুর তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, আরে সাইফুল ইসলাম কোথা থিকা আইলা, তুমিও কি পলাতক নাকি? সাইফুল ইসলাম বললো, কি আর বলবো হুজুর, আমাদের মোজাফফর ন্যাপের লোকজন প্রায় সবাই ভারতে চলে গেছে। আমি আটকা পড়ছি, তাই সাথি খুঁজছিলাম। আপনার খবর বলেন।

ভাসানী বললেন, 'আমার বিন্নাফৈরের বাড়িতে আগুন দিছে পাকিস্তানের মিলিটারি।' আমি বাড়িতেই ছিলাম, কোনো রকমে প্রাণ নিয়া পলাইয়া এখানে এক মুরিদের বাড়িতে আছি। চেনা নৌকা খুঁজতেছি আসাম যাওয়ার জন্য। ওনারা কথা বলছেন এমন সময় হাজী সাহেবের লোক এসে ভাসানীকে সালাম দিয়ে বললো, হুজুর আপনার নৌকা ভাড়া হয়ে গেছে, হাজী সাহেব আপনাকে এখনই বাসায় গিয়ে খাওয়া দাওয়া করে রেডি হতে বলেছেন, দুপুরের পরে নৌকা ছেড়ে দেবে। চলেন বাড়ি চলেন।

ভাসানী তখন সাইফুল ইসলামকে জিজ্ঞেস করলেন, সাইফুল তুমি কী করবা? সাইফুল বললো, আমি আপনার সাথেই যাব। চলেন আপনার সাথে গিয়ে জায়গাটা চিনে আমার ব্যাগটা নিয়ে আসি। তখন তাঁরা দুজনে একটা রিকশায় উঠলেন। হাজী সাহেবের দোকানে পৌঁছে হুজুর জামাল সাহেবকে বললেন, 'এই সাইফুল ইসলাম আমাদের পার্টির লোক আমার সঙ্গে যাইবো তোমার কোনো আপত্তি নাই তো? জামাল হাজী বললেন, সে তো খুব ভালো কথা আপনি একা যাওয়ার চেয়ে একজন সাথী থাকা ভালো।'

চলেন গোসল করে খেয়ে নেবেন। মাওলানা সাহেব সাইফুল ইসলামকে তার ব্যাগ নিয়ে আসতে বললেন এবং নিজে বাড়ির ভেতর গিয়ে গোসল করতে বাথরুমে ঢুকলেন। গোসল সেরে তিনি খেতে বসে গেলেন। বেগম সাহেবা হুজুরকে আজ নানা পদ দিয়ে খাওয়ালেন। হুজুরও খেতে ভালোবাসেন, পেটপুরে খেলেন, সামনে কয়দিন নৌকায় থাকতে হবে খাওয়ার কি জুটবে আল্লাহ জানেন। খাওয়ার পর হুজুর হাজী সাহেব যে ব্যাগ কিনে দিয়েছেন তা

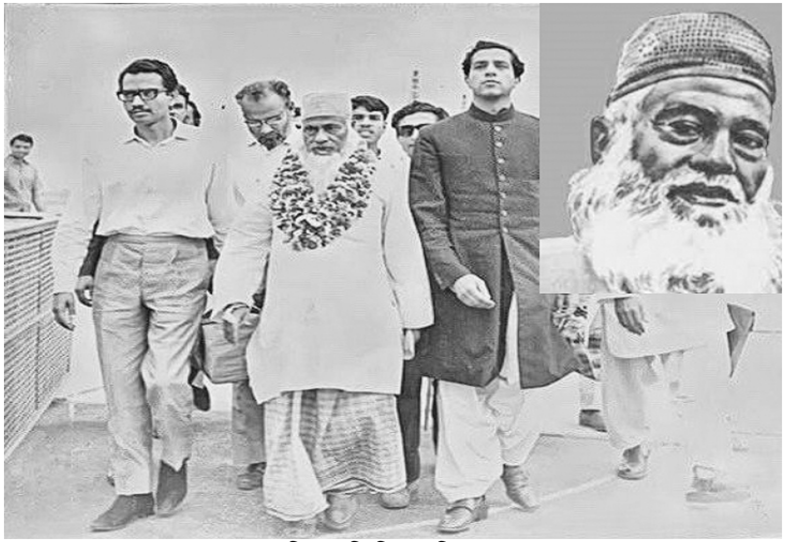

গোছাতে বসলেন। ব্যাগ গুছিয়ে তিনি পানি খেলেন এবং বেগম সাহেবাকে এক বোতল খাওয়ার পানি দিতে বললেন। তারপর তিনি এই বাড়ির সবাইকে দোয়া করে হাজী সাহেবের কাছে গেলেন। সাইফুল ইসলাম তখনও আসে নাই। তিনি বসে হাজী সাহেবকে সাবধানে থাকতে বললেন। তিনি যে হাজী সাহেবের বাড়িতে এসেছিলেন তা কাউকে জানাতে মানা করলেন, কারণ সরকার তাঁর খোঁজ করছে। এরমধ্যে সাইফুল ইসলাম এসে সালাম দিয়ে দাঁড়াল। হাজী সাহেব তখন একজন কর্মকর্তাকে ডেকে হুজুরকে নৌকায় তুলে দিয়ে আসতে বললেন এবং নিজে হুজুরকে সালাম করে দোয়া নিলেন। মাওলানা উপস্থিত সবাইকে দোয়া করে রিকশায় উঠে বসলেন। তিনি ও সাইফুল এক রিকশায় বসলেন। অল্প সময়ের মধ্যে রিকশা নৌকার ঘাটে পৌঁছে গেল।

মাওলানা ভাসানীকে দেখে মাঝি সিরাজ এগিয়ে এসে সালাম দিয়ে বললো হুজুর কি ইন্ডিয়ার বাড়িতে রওনা হইলেন? মাওলানা বললেন, তর নাও ঠিক করছে তয় আর কোনো চিন্তা নাই। হাজীর কর্মকর্তাকে বললেন, 'তোমার মনিবকে কইয়ো যে মাঝি আমার খুবই পরিচিত।'

মাওলানা সাহেব ও সাইফুল ইসলাম নৌকায় উঠলেই মাঝি নৌকা ছেড়ে দিল। নৌকা চললো, আসামের পথে, প্রথম গন্তব্য ভাসানের চর।

পর্ব ৪

মাওলানা ভাসানী, নামকরা ডাকাত মাঝি সিরাজের পাঁচশ মন পাটের নাওয়ে উঠেছেন, আসাম যাওয়ার জন্য। সিরাজ তাঁর পূর্ব পরিচিত। তিনি নাওয়ে উঠে ভালোমত বসে পান তামাক খেতে খেতে সিরাজের সাথে গল্প শুরু করলেন। তিনি সিরাজকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন, এইবার কয়শ মন পাট নিয়া যাইতাছ? সিরাজ বললো, পাঁচশ মন। তখন ভাসানী জিজ্ঞাসা করলেন, আইচ্ছা তোমরা এইযে দেশের পাট এত কস্ট কইরা ইন্ডিয়ায় নিয়া মাওরাদের

কাছে বিক্রি কর, তোমাদের খারাপ লাগে না? উত্তরে সিরাজ বলে, এখানে পাটের দাম এক্কেরে পইড়া গেছে, ইন্ডিয়ায় তিনগুন দাম পাওয়া যায়, আর ওখান থিকা অনেক জিনিস নাও ভইরা নিয়া আইসা এখানে নদীর পাড়ের হাটে হাটে মহাজনদের কাছে বিক্রি করি, তাতেও অনেক লাভ হয়। তাছাড়া ইন্ডিয়া থিকাও অনেক নাও আসে মাল নিয়া, দুই তরফেই ব্যবসা হয়। আর এবার তো নদীর পথ একাবারে খোলা, মিলিটারিরা পানিতে নামে না, ভয় পায়। মাওলানা তখন জিজ্ঞাসা করলেন তোমার নাওয়ে হিন্দু যাত্রী নাই? সিরাজ বললো, আছে হুজুর আছে, তবে তারা দিনের বেলা নিচে থাকে, রাতে ওপরে ওঠে। রাতে তাদের দেখতে পাবেন।

দুপুরে ভাসানী গোসল করে খেতে বসলেন। নৌকার মাল্লারাই রান্না করেছে। সাধারণ পদ, ভাত, ডাল, মুরগির মাংস। সিরাজ বললো, হুজুর একয় দিন একটু কস্ট হইবো খাওয়া দাওয়ায়। অন্য যাত্রীরা সব নিজেদের আনা চিড়ামুড়ি খাইয়া দিন কাটায়। ভাসানী বললেন, 'নাওয়ে তুমি মুরগির মাংস খাওয়াইলা আবার কী কথা।' খুব ভাল খাইলাম, এখন পান তামাক দেও। পান তামাক খেয়ে ভাসানী শুতে গেলেন।

ওদিকে সিরাজগঞ্জে ভাসানীর মুরীদ জামাল হাজীর দোকানে পুলিশ এসে হাজির। তারা ভাসানীর খোঁজে এসেছে। থানার ওসি নিজে এসেছেন ভাসানীকে ধরতে। পুলিশ এর গোয়েন্দাদের কাছে তারা খবর পেয়েছেন। জামাল হাজী ওসি সাহেবকে বাসার ভেতরে নিয়ে খাতির করে বসালেন, স্ত্রীকে চা দিতে বললেন। ওসি সাহেব বললেন, 'এখন চা খাবো না, আপনি ভাসানীর খবর বলেন। হাজী সাহেব বললেন হুজুর তো তিন দিন আগে এসেছিলেন, গতকাল সকালে আবার টাঙ্গাইলে চলে গেছেন। ওসি সাহেব তার কথায় বিশ্বাস করলেন না। সমস্ত ঘর বাড়ি দোকান সব সার্চ করলেন, ভাসানীকে না পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে জামাল হাজীকে বললেন, চলেন, আপনি থানায় চলেন, ওখানে মিলিটারির সামনে স্টেটমেন্ট সই করবেন, এখন যা বলছেন, তাই লিখে, তারপর তারা যা বলে, তাই হবে। জামাল হাজীর সাথে ওসি সাহেবের ভালো জানাশোনা, তিনি ওসি সাহেবকে বললেন, এটা করবেন না, আমাকে মিলিটারির সামনে নিয়ে যাবেন না, তার জন্য যা করা লাগে, আমি করবো। ওসি তো কিছুতেই মানবে না। শেষ পর্যন্ত লাখ টাকার বান্ডিল দিয়া মিটাতে হলো। চলে যাবার আগে ওসি জামাল হাজীকে একপাশে ডেকে নিয়ে কয়েক দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে বললেন। জামাল হাজী কালবিলম্ব না করে, গোপন স্থানে চলে গেলেন।

সিরাজ মাঝির নাওয়ে বিশ জনের মত যাত্রী, রাতের বেলায় ওপরে উঠে এলো। ভাসানী এতো লোক দেখে অবাক। দুই চারজনের সাথে কথা বললেন, তারা কোথা থেকে আসছেন কোথায় যাবেন, এইসব জিজ্ঞেস করলেন। সবাই মাইনকার চরে যাচ্ছেন বললেন, আসছেন টাঙ্গাইল ও সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন গ্রাম থেকে। প্রতিজনে ৩০০ টাকা করে দিয়েছেন নৌকা ভাড়া খাওয়া দাওয়া নিজেদের মধ্যে। ভাসানী তাদের ভরসা দিয়ে বললেন এই নাওয়ে কোনো বিপদ নাই, নিশ্চিন্তে পৌঁছাতে পারবেন। যাত্রীরা সবাই ভাসানীকে সালাম জানিয়ে বললেন- 'আপনি যখন নাওয়ে উঠছেন তখনই আমরা সবাই নিশ্চিন্ত হইছি যে, আর কোনো ভয় নাই।'

রাতের খাবার খেতে খেতে ভাসানী সিরাজ মাঝিকে বললেন, 'রাইতে কি কোনো ডর আছে নাকি? সিরাজ বললো ছোট খাট ডাকাইতের দল আশেপাশে উৎপাত কওে, আমাগোর নায়ের কাছে আসার সাহস করে না। রাত বেশি হইলে দুই একটা হাক দিয়া জানান দেই, যেন ভুল কইরা আমাগো নায়ের ধারে না আসে। অন্য নায়ে ডাকাতি হয় সে তো আপনে জানেনই।

রাতে খাওয়া দাওয়া করে ভাসানী শুয়ে পড়লেন।

সে রাত ভালোভাবে কেটে গেল। সকালে ভাসানী নাস্তা করার সময় সিরাজকে বললেন 'গতরাতে তো কোনো গন্ডগোলের ভাঁজ পাইলাম না। সিরাজ বললো, এটা তো আমাগোর এলাকা, এখানে অন্যরা আসার সাহস করে না।' আমাগোর এলাকা পার হইলে আইজ রাইতে ভাঁজ পাইবেন।

সারাদিন একেবারে সুনসান গেল, মিলিটারির কোনো দেখা নাই। ভাসানী তাদের কথা জিজ্ঞাসা করলে সিরাজ বললো, মিলিটারিরা পানিতে নামতে ডরায়। লঞ্চ নিয়া নদীর কিনারা দিয়া যায়, মাঝ নদীতে আসার সাহস নাই।
রাতে যথাসময়ে খাওয়া দাওয়া করে ভাসানী শুয়ে পড়লেন। মধ্যরাতে হৈ চৈ শব্দে ভাসানীর ঘুম ভাংলো। জেগে বসে তিনি সিরাজ মাঝির হাক শুনতে পেলেন -

"সিরাজ ডাকাইতের নায় মাওলানা ভাসানী যায়
যার মরার খায়েশ আছে সে সামনে আয়।"

হাক শুনে মাওলানা বেরিয়ে এসে সিরাজের পাশে দাঁড়ালেন এবং জিজ্ঞাসা

হইতাছে, তাই সাবধান করতাছি, যেন এদিকে না আসে। মাওলানা দেখলেন সিরাজের হাতে বন্দুক আর অন্য মাঝিমাল্লা ও যাত্রীদের হাতে নানা অস্ত্র শস্ত্র। সবাই ডাকাত ঠেকানোর জন্য প্রস্তুত। সিরাজ ঐ নাওয়ের দিকে বন্দুকের একটা ফাঁকা আওয়াজ করলো, তারপর খুব জোরে একটা হাক দিল। এর কিছুক্ষণ পরে সব চুপচাপ হয়ে গেল। মনে হয় ডাকাতেরা অন্যদিকে চলে গেল।

বাকী রাতটা উত্তেজনার মাঝে কেটে গেল। ডাকাতের আবার ফিরে আসতে পাওে, সেই আশংকায় সবাই জেগে রইল। পরের দিন সকালে ভাসানী সিরাজকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, ভাসানের চর পৌঁছাতে আর কত সময় লাগবো? উত্তরে সিরাজ বললো, আরও একদিন লাগবো, আগামীকাল দুপুর নাগাদ আমরা ভাসানের চর পৌঁছাতে পারবো আশা করি। ভাসানী বললেন, একসময় আমি ভাসানের চরের নেতা ছিলাম, আমার কৃষক আন্দোলন তো ওখান থেকেই শুরু হয়েছিল। কতোবার যে সরকার আমাকে ধরে নিয়ে গেছে তার ঠিক নাই। কিন্তু আমি আন্দোলন ছাড়ি নাই, কৃষকদের দাবি আদায় করে ছেড়েছি। তাইতো ওখানকার কৃষক ও সাধারণ জনগণ আমার নামের শেষে ভাসানী শব্দ যোগ করে দিল, আমার নাম হলো মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। এখন সব বাদ দিয়ে সবাই আমাকে মাওলানা ভাসানী বলে ডাকে।

মাওলানা সাহেব সিরাজকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই এলাকায় ডাকাতদের উৎপাত কেমন? আজ রাতেও কি আবার হানা দিবো নাকি ? সিরাজ বললো, না হুজুর, আমরা তো ইন্ডিয়ার কাছে আইসা পড়ছি, এখানে মাঝে মাঝে ইন্ডিয়ার বিএসএফ টহল দেয়, কয়েকটা ডাকাতদল ধরা পড়ার পর এই এলাকায় ডাকাতদের উৎপাত কমে গেছে। তবুও আইজ রাইতে আমরা সাবধানে থাকুম, কারণ ইন্ডিয়ার ডাকাতদের ভয় আছে এখানে।

সেদিন সন্ধ্যায় সিরাজ সমস্ত যাত্রীদের ডেকে এখনই রাতের খাওয়া খেয়ে রাত বারটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে নিতে বললো, কারণ রাত বারটা থেকে ফজরের আজান পর্যন্ত পাহাড়া দিতে হবে। আজ রাত পার হলে আর চিন্তা নাই। ভাসানী ও সন্ধার পরেই খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে পড়লেন, তিনিও সবার সাথে পাহাড়া দিবেন।

রাত বারটায় সবাই জেগে ওঠে পাহাড়ার জন্য প্রস্তুত, অস্ত্র শস্ত্র ও লাঠি শোঠা নিয়া ডাকাত ঠেকানোর জন্য তৈরি। ভাসানীও বিছানা ছেড়ে উঠে তামাক নিয়ে বসলেন, সাইফুল ইসলামও এসে তাঁর কাছে বসে কথাবার্তা শুরু করলেন। নাওয়ের মধ্যে বেশ একটা রমরমা ভাব দেখা গেল। তবে রাত নিরাপদেই কেটে গেল। ফজরের আজান দিলেই ভাসানী মুসলমান ভা্ইদের নিয়ে নামাজ পড়া শুরু করলেন, আর হিন্দু যাত্রীরা গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

পরদিন সকালে নাস্তার পর ভাসানী সিরাজকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভাসানের চরে পৌঁছাতে আর কতক্ষণ লাগবে ? সিরাজ বললো, হুজুর আর এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা পৌঁছে যাব। সত্যিই তাই!

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভারতীয় পতাকা দেখা গেল। তার কিছু পরে ভাসানের চর এর ঘাট দেখা গেল।

ভাসানী তার কাপড়চোপড় গুছিয়ে ব্যাগে ভরে তৈরি হলেন। সাইফুল ইসলামও তার ব্যাগ নিয়ে এলো। সিরাজ এসে সালাম দিয়ে ভাসানীকে

বললো, হুজুর আপনি আমার মাথায় হাত রাইখা দোয়া কইরা দেন যেন সহি সালামত দেশে ফিরা যাইতে পারি। কথা বলতে বলতেই নাও ঘাটে ভিরল। সিরাজ ভাসানীকে নিয়ে ঘাটে নামলো। ভাসানীকে দেখে ভাসানের চর এর লোকজন সব তাঁকে ঘিরে ধরলো বেশ একটা হৈচৈ শুরু হলো।
সিরাজ ভাসানীর নিকট বিদায় নিয়ে নাও ছেড়ে দিল। আর ভাসানের চরের লোকজন ভাসানীকে নিয়ে মিছিল করে এলাকা প্রধানের বাড়ির দিকে চললো।

পঞ্চম পর্ব

ভাসানের চরের প্রধানের অফিস ঘরে মাওলানা ভাসানীর থাকার ব্যবস্থা হলো। খাওয়া দাওয়ার পরে হুজুর তামাক খেতে খেতে আসামের স্মৃতিচারণ শুরু করলেন। তিনি বলতে শুরু করলেন, আমি আসামে আসি বাংলাদেশ থিকা আসা কৃষকদের অনেক পরে। তখন এখানকার অবস্থা খুব খারাপ ছিল। জঙ্গলে ভর্তি ছিল চারিদিক, দিনের বেলায় বাঘের উৎপাতে অস্ত্র হাতে নিয়া চলতে হইতো। রাইতের বেলায় আগুনের বোন্দা জ্বালাইয়া পাহাড়া দিতে হইতো। সাপের কামড়ে কত লোক যে মারা যাইত তার ইয়ত্তা নাই। নানা রকম অসুখ, যেমন ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর লাইগাই থাকতো।

বাংলার কৃষকেরা আসামে প্রথম পাট চাষি। সস্তাগন্ডার দেশ উর্বর জমির দেশ বিশাল আসামে বাঙালি কৃষকের সংখ্যা দাঁড়ালো কয়েক লাখের উপর। টনক নড়লো কায়েমি স্বার্থের। আসাম সরকার লাইন টেনে বাঙালি চাষীদের সীমানা এতোই সীমিত করে দিলেন যে নতুন করে শুরু হলো জমি সমস্যা। যে সব জমিতে বাঙালি কৃষকেরা ইতিমধ্যে আইন সঙ্গতভাবেই বসতি স্থাপন করে আবাদ শুরু করেছিল সেখান থেকে তাদের উচ্ছেদ অভিযান চললো। নির্মম বাঙাল খেদা আন্দোলন চলতে থাকলো।

ভাসানীর ডাকে মানুষ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। সফল হয়েছিল লাইন প্রথা বিরোধী আন্দোলন। বন্ধ হয়েছিল বাঙাল খেদা আন্দোলন। মাওলানা সাহেবের স্মৃতিচারণ শুনতে শুনতে রাতের খাবারের ডাক পড়লো।

পরদিন সকালে জানা গেল আমাদের মেঘালয়ের রাজধানী তুরায় যেতে হবে। কিন্তু ঐদিন বিকেলে তুরায় যাওয়া বাতিল হয়ে গেল এবং মাওলানা সাহেবকে গৌহাটি বিমান বন্দর হয়ে বিমানে কলকাতা যেতে হবে, এই সংবাদ দেওয়া হলো।
সেই রাতে রেডিওতে জানা গেল প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের অভিষেক অনুষ্ঠান হলো মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আমবাগানে। মাওলানা ভাসানীকে বললাম আমাদের দেরি হয়ে গেল। তিনি মন্তব্য করলেন, ‘এখন ভারত সরকার কতটুকু করে সেটাই দেখার তবে আমার অতিসত্বর কলকাতা যাওয়া দরকার। সেখানে না গেলে কিছুই বোঝা যাইব না। কিন্তু কলকাতা বেশিদিন থাকা যাইব না, কারণ ওখানে নকশালদের বহুত উৎপাত।

মাওলানা সাহেব সেই দিন বিকেলে গৌহাটি বিমান বন্দরে পৌঁছলেন। নির্ধারিত বিমান তখনো এসে পৌঁছেনি। তাঁকে ভি আই পি লাউঞ্জে বসানো হলো, এবং বিশেষ সিকিউরিটি অফিসার তাঁর সাথে থাকলেন, যেন কেউ উৎপাত না করে।

ভারত সরকার চায় না, ভাসানীর পরিচয় কেউ জানুক। সিকিউরিটি অফিসার ভাসানীকে বললেন, কেউ নাম জিজ্ঞেস করলে বলবেন, 'আবদুল হামিদ, ভাসানী বলবেন না।' কারণ আপনি যে মাওলানা ভাসানী প্লেনে এটা কেউ জানুক তা ভারত সরকার চায় না। ভাসানীর আসামের জনগণের উপর দারুণ প্রভাব, তাই তাঁকে আসাম থেকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ভাসানী আসাম হয়ে ভারতে কেন ঢুকলেন এটাও একটা প্রশ্ন। ভি আই পি লাউঞ্জে বসে মাওলানা সাহেব ইচ্ছে প্রকাশ করলেন, কলকাতার কাজ সেরে তিনি আসামে ফিরে আসবেন। আসাম বাংলার সীমান্তবর্তী স্থানে কেনো যুদ্ধ এলাকার কাছাকাছি থাকবেন, যতদিন থাকতে হয়। ভারতের নয় মাসের জীবনে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার ও উপদেষ্টা পরিষদের সাথে মতভেদের কারণে তিনি বলতেন, তুলবেন। ভারত সরকারকে গ্যারান্টি দিতে রাজি আছেন আসামে থাকাকালীন ভারতীয় রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।

অনেক রাতে ভাসানীকে বহনকারী প্লেন দমদম বিমান বন্দরে পৌঁছালো। দেরি হওয়ার কারণ আবহাওয়া খারাপ থাকায় অজানা কোনো এক বিমান বন্দরে প্লেন নেমেছিল। ক'জন উচ্চ পদস্থ সিভিল ও পুলিশ অফিসার মাওলানা ভাসানীকে অভ্যর্থনা জানালেন।

বিমানবন্দর হতে সরাসরি পার্ক স্ট্রিটের কোহিনুর প্যালেসে ভাসানীকে নিয়ে যাওয়া হলো। পাঁচ তলার একটি ফ্ল্যাট মাওলানা সাহেবকে বরাদ্দ করা হলো। তাঁর সাথে সাইফুল ইসলাম ও আর একজন থাকলো। দরজায় সর্বক্ষণ পাহাড়া বাইরে যাওয়ার জন্য অনুমতি নিতে হবে, এতো অনেকটা বন্দী জীবনযাপন করার মতো। তবে মাওলানা সাহেব কয়েক দিন চুপ চাপ বিশ্রাম করলেন। একদিন বিকেলে মাওলানা সাহেব সাইফুল ইসলামকে ডেকে বললেন, মুখার্জি বাবু কে খবর দাও, দেখি পাহাড়া বসাইছে কেন জিজ্ঞেস করি। সাইফুল মুখার্জি বাবু কে খবর দিলেন।

খবর পেয়ে মুখার্জি বাবু এসে ভাসানীকে সালাম দিয়ে দাঁড়ালেন। ভাসানী তাঁকে বসতে বললেন। তারপর বললেন দরজায় পাহাড়া বসাইছেন কেন? আমারে অন্তরীণ করছেন নাকি। মুখার্জি বাবু বললেন, 'আপনাকে অন্তরীণ করার প্রশ্নই ওঠে না।' আপনি হচ্ছেন ভারত সরকারের সম্মানিত অতিথি। বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে আপনার সিকিউরিটির ব্যবস্থা করা হয়েছে। আপনি সচ্ছন্দে সর্বত্র যাতায়াত করতে পারেন। আপনার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুনে ভাসানী বললেন, 'তাহলে এখনি একটু গঙ্গার তীরে বেড়িয়ে আসি।' তখন মুখার্জি বাবু বললেন, 'আপনার আপত্তি না থাকলে আমি আপনার সাথে আসতে পারি।' ভাসানী সম্মতি দিয়ে বললেন, আমার পি. এ, সাইফুলও আমাদের সাথে যাবে। তাই হলো, মাওলানা ভাসানী, মুখার্জি বাবু এবং সাইফুল ইসলাম গাড়িতে করে গঙ্গাতীরে ভ্রমণে গেলেন। গঙ্গাতীরে গিয়ে ভাসানী গাড়ি থেকে নেমে হাটতে শুরু করলেন। তাঁর হাটার

বেগের সাথে অন্য দুজন পেরে উঠলেন না, তারা পিছিয়ে পড়লেন। সাইফুল ইসলাম ভাসানীকে ডেকে বললেন, হুজুর একটু আস্তে যান, আমরা অনেক পিছিয়ে পড়েছি।

ভাসানী ডাক শুনে থামলেন, ওরা কাছে এলে বললেন, 'অনেক দিন পরে আজ গঙ্গা তীরে হাওয়ায় হেটে বড়ো আনন্দ লাভ করলাম। চল এখন আস্তে আস্তে যাই। তারপর তিনজন একসাথে বেশ খানিকক্ষণ হেটে ফিরে এসে গাড়িতে উঠে বাসায় চলে এলেন। ভাসানী মুখার্জি বাবু কে বললেন, 'চলেন ঘরে বসে একটু চা খাওয়া যাক।'

সাইফুল চায়ের ব্যবস্থা করতে গেল, ওনারা দুজন ঘরে গিয়ে বসলেন। মুখার্জি বাবু ভাসানীকে বললেন, 'আপনার ইচ্ছেমত বাইরে যাবেন, কোনো বাধা নিষেধ নাই।' আপনার সিকিউরিটির জন্য কেউ একজন আপনার সাথে যাব। এটা বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধ। ভাসানী বললেন, 'আসামে তো আমি ইচ্ছামত একাই সব জায়গায় যাই, তবে কলকাতা শহরের রাস্তা ঘাট

চিনি না একজন সাথে থাকলে ভালোই হয়।' চা খেয়ে মুখার্জি বাবু বিদায় নিলেন। সাইফুল ইসলাম ভাসানীকে তামাক এনে দিলেন, ভাসানী আরামে হুকোয় টান দিলেন।

ষষ্ঠ পর্ব

মাওলানা সাহেব কলকাতায় প্রকাশ্যে বাইরে যেতে চাইতেন না। ভারত সরকারও এ নিয়ে কোন তাগিদ দেখাতেন না। ভাব দেখে মনে হতো কোথায় যেন একটা যোগসূত্র আছে। বার বার বলাতেন তিনি কলকাতার প্রেসক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির থাকতে
রাজি হলেন না। মাওলানা সাহেব প্রেস কনফারেন্সে রাজি, তবে সাংবাদিকদের সামনে নিজে যাবেন না, সাইফুলকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে যেতে বলছেন। একথা মি. মুখার্জিকে বলতেই তিনি বললেন, 'বেশ তো

অসুবিধা কি? ভাবা গিয়েছিল প্রেস কনফারেন্সের মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশে মাওলানা সাহেবের সর্বশরীর উপস্থিতির জন্য সরকার তাগিদ দেবেন।' কিন্তু তা হলোনা। ভাসানী নিজে উপস্থিত না হয়ে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরার জন্য তাঁর বিশ্বাস ভাজন পি. এ. সাইফুল ইসলামকে পাঠালেন কলকাতা প্রেস ক্লাবে। সেখানে তার ব্যক্তব্য পত্রপত্রিকায় গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়।
প্রশ্নত্তোর পর্বে একজন সাংবাদিক জিজ্ঞেস করলেন, যতদূর জানি ভাসানী কলকাতাতেই আছেন, তিনি নিজে এলেন না কেন? উত্তরে সাইফুল ইসলাম বললেন. তিনি দুদিন হয় অসুস্থ আছেন বলে আজ আসতে পারেননি।

মাঝে মধ্যে ভাসানীর বিবৃতি প্রকাশিত হচ্ছিল, স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের মধ্যে তা যেমন আশা ও উদ্দিপনার সৃষ্টি করছিল, তেমনি কেউ তাঁকে স্বশরীরে কলকাতা বা অন্য কোথাও দেখতে না পাওয়ায় ধীরে ধীরে প্রচারিত হয় যে ভারত সরকার তাঁকে অন্তরীণ করে রেখেছেন। কিন্তু কথাটা ঠিক নয়, বললেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মইনুল হক চৌধুরী।

তিনি বললেন, শিগগিরই দিল্লিতে দেখা যাবে, এখন তিনি কলকাতায় আছেন। মাওলানা ভাসানী কলকাতায় যে ফ্ল্যাটে থাকতেন সেখানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন সাহেবের পরিবার কয়েক দিন ছিলেন।
তাঁর মেয়ে রিমির লেখায় আমরা পাই- ২৯ এপ্রিল সকালে পার্ক স্ট্রিটের একটা ফ্ল্যাট বাড়িতে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো। এই বাড়ির নাম "কোহিনূর ম্যানশন"। দশতলা ফ্ল্যাটবাড়ি। আমরা চারতলার রাস্তার দিকের ফ্ল্যাটে ঢুকেই দেখি সোফায় মাওলানা ভাসানী সাহেব বসা। তিনি আমাদের স্বাগত জানালেন।

২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪ শহীদ মিনারে সমাবেশ। রয়েছেন মাওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবর রহমান, আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ, তাজউদ্দিন আহমেদ এবং মহিউদ্দিন আহমেদ।

Meeting at Shahid Minar on 21 February, 1964. Moulana Bhasani, Sheikh Mujibur Rahman, Abdur Rahman Tarkabagish, Tajuddin Ahmed and Mohiuddin Ahmed presented among others.

দাতা: রাশেদ খান মেনন
Donor: Rashed Khan Menon

মাওলানা ভাসানী এই বিরাট ফ্ল্যাটটিতে থাকেন। আমাদের জন্য এখনো বাসা ঠিক হয়নি, তাই কয়েক দিন এখানে থাকবো। ছোট একটি ঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।
মিমির সেই যে শরীর খারাপ- এখানে এসে রক্ত আমাশয় দেখা দিয়েছে। মিমি প্রায় বিছানার সঙ্গে মিশে আছে- কথা বলে না। এরই মধ্যে রিপিরও প্রচণ্ড জ্বর-পেটে ব্যথা। আমাদের সবার মন খারাপ। ডাক্তার দেখানো হচ্ছে, কিন্তু ভালো হওয়ার লক্ষণ খুব ধীর।

ভাসানী সাহেব মাঝে মধ্যে মধ্যেই আমাদের কাছে নিয়ে বসেন। আব্বুর খুব প্রশংসা করে বলেন, তাজউদ্দীন আমার যোগ্য ছেলে, ওর প্রতি আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট। আরও কত কথা বলেন, সেই আব্বুর ছাত্র জীবনের কথা রাজনীতির প্রতি একাগ্রতা আর নিষ্ঠার কথা। রাজনীতি, দেশ আর মানুষ-এই তিন যে কীভাবে তাজউদ্দীনের রক্তে মিশে আছে, গর্ব করে সেকথা বলেন। আওয়ামী লীগ গঠনে তাঁর পাশাপাশি থেকে সে সময়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তরুণ তাজউদ্দীনের অবদানের কথা আনন্দের সঙ্গে প্রকাশ করেন।
খুব মজা করে বললেন, '১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনের সময় যুক্তফ্রন্টের পার্থী তাজউদ্দীনের এলাকা কাপাসিয়ায় তিনি মস্ত বড় হাতির পিঠেচড়ে গিয়েছিলেন। সেই হাতিটা ছিল তাজউদ্দীনের ছোট বোনের শ্বশুরবাড়ির। হাতির পিঠে চড়ে গহিন গজারিবনের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে তাঁর মনে হয়েছিল, কি জানি বাবা আবার বাঘের হাতে পড়েন কি না।

দাদু-মাওলানা ভাসানী আমাদের ঘরের ভেতর নিয়ে একটু-আধটু খেলারও চেষ্টা করেন। আম্মার হাতের রান্না তাঁর খুব পছন্দ। তাঁর অনুরোধে আম্মা দু-একবার রান্না করে দেন। রোজ দুপুরে তাঁর খচমচ করে একগাদা শুকনো মরিচ খাওয়া দেখে আমি অবাক হয়ে যেতাম।

দেখতে দেখতে প্রায় এক সপ্তাহ চলে যায়। ইতোমধ্যে আমাদের জন্য ফ্ল্যাট ঠিক হয়েছে। আমরা যেদিন যাব ঠিক সেদিনই মাওলানা ভাসানী প্লেনে করে শিলং গেলেন।

সৈয়দ আবুল মাকসুদের ভাসানীচরিত গ্রন্থে বলা হয়েছে ভারতে নয় মাস অবস্থানকালে ভাসানী কখনো দীর্ঘ সময় এক জায়গায় ছিলেন না। কখনো কলকাতা, পুণ্ডিবাড়ি, দিল্লি, দেরাদুন, কখনো রানীক্ষেত, আলমোড়া, আসামের ভাসানচর প্রভৃতি স্থানে ছিলেন। তিনি চীনপন্থী-এ ব্যাপারটায় অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়। তিনি নজরবন্দী থাকলেও ছিলেন একজন জাতীয় নেতার মর্যাদায়। তাঁর থাকা-খাওয়া-চিকিৎসার ক্ষেত্রে যাতে কোনো অবহেলা ও অযত্ন না হয়, সেদিকে ভারত সরকার কঠোর দৃষ্টি রেখেছে সব সময়।

ভাসানীর জন্য ভারত সরকারের আতিথ্য ছিল কার্পণ্যহীন। কলকাতার একটা বিখ্যাত অঞ্চলে একটি বিরাট ফ্ল্যাট তাঁর থাকার জন্য দেওয়া হয়।তাঁকে গাড়ি দেওয়া হয়। সর্বত্তোম চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা সবসময় তাঁর দেখাশোনা করতেন, এটাকে অনেকে অন্তরীণ করা হয়েছে বলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি
করতো। কিন্তু ভাসানী বলতেন, ভারত কবি গুরু, গান্ধী, চিত্তরঞ্জন, সুভাষ, নেহেরু, মাওলানা আযাদের দেশ। নেহেরুর সাথে আমার ঘনিষ্টতা ছিল। ইন্দিরা তাঁর মেয়ে।
আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত সরকার সাহায্য করবে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। ভারত সরকার এখন আমাদের বন্ধু, বিপদের বন্ধু। আর যে চীনের

সাথে এত দোস্তী ছিল দুর্দিনে তারা সইরা দাঁড়াইলো, মুখ ফিরায়া নিল।

সপ্তম পর্ব

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রধান কার্যালয়ের দরজায় এসে ভারতীয় স্টাইলে দুহাত জোর করে নমস্কার করে মাওলানা ভাসানীকে অভ্যর্থনা জানালেন। প্রত্যুত্তরে মাওলানা ভাসানী সালামের ভঙ্গিতে একহাত তুললেন। আসনে বসে প্রাথমিক কুশল বিনিময়ের পরে মাওলানা সাহেব তাঁর ঐতিহ্য বজায় রেখে কথার সূত্রপাত করলেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বয়স আমার কম হইল না। মাওলানা আজাদের সাথে আমার পরিচয় ছিল। এশিয়ার মুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী আপনার পিতার সাথে আমার দোস্তি ছিল। এলাহাবাদে আনন্দভবনে গেছি। তখন আপনি বালিকা। সে সুবাদে আপনি আমার মেয়ের মত।

ইন্দিরাগান্ধী মিস্টি হেসে মাওলানা সা বের কথায় সম্মতি জানালেন। তার পরে বললেন, 'আপনি আমাদের সম্মানিত অতিথি, উপমহাদেশের বয়োজ্যেষ্ঠ রাজনীতিবিদ। মেয়ের মেহমানদারীতে কোন

ক্রুটি নেই তো?

অভিযোগ থাকলে আপনার কানে কখন পৌঁছে যেত। যে আরাম আয়েসে রেখেছেন তাতে আমার তামাম জীবনের আদর্শ বরবাদ হয়ে গেল। আইলাম যুদ্ধ করতে, আর হয়ে গেলাম মেহমান।

মেয়ের বাড়িতে বাপের আদর যত্ন না হলে মেয়ের দুর্নাম হবে না? কিন্তু আপনি বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের মিটিং-এ যাচ্ছেন না কেন?

যাইয়া কি হইব। গেলেই ঝগড়া-ঝাটি।

ঝগড়া-ঝাটি কোথায় নেই। ঝগড়া-ঝাটির মধ্য দিয়েই পথ বেড়িয়ে আসে। আপনি না গেলে নানা কথা উঠবে।

ওরা আযাদির লড়াই মৌরসীপাট্টা করে নিছে। আপনার সরকার আমাকেতো ভারতে ঢুকতে দিতে চায় নাই।

- তবুতো ঢুকেছেন।
- শুধু ঢুকি নাই, আপনার মেহমান হইছি। বাংলার আযাদীর লড়াইয়ে আপনার সরকারের সাহায্য সহযোগিতার জন্যে শোকরিয়া জানাইতেছি।
- দেখুন মওলানা সাহেব, বাংলাদেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ে আপনাদের নানাজনের নানা মত হবেই। স্বাধীনতার রূপরেখা সম্পর্কেও কি সবার চিন্তা ভাবনা এক? চিন্তা- চেতনার স্তরের একটা ব্যাপার আছে না?

মাওলানা সাহেব প্রধানমন্ত্রীর উঠানো প্রশ্নটার উত্তরে বললেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন, নানাভাবে মদদ দিতেছেন, কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতেছেন না কেন? প্রধানমন্ত্রী মৃদু হেসে বললেন,

সময় হলেই দেব।

কবে সময় হবে ?

এই মুহূর্তে স্বীকৃতির চাইতে বড় প্রশ্ন আপনাদের নিজস্ব শক্তিতে লড়াইটা সংগঠিত করা। আপনারা নিজেরা যদি দুশমনকে ঘায়েল করতে পারেন সেটাই সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দুনিয়ায় আপনাদের প্রমাণ করতে হবে

এটা বাংলাদেশের নিজস্ব মুক্তিযুদ্ধ। এটা যত দৃঢ় ভাবে হবে ততই আমাদের পক্ষে সব কাজ সহজ হয়ে আসবে।

প্রধানমন্ত্রী আঁচ বুঝেই ঘাঁ দিলেন। তিনি যেন স্বাধীনতা লড়াই সম্পর্কে মাওলানা ভাসানীর মানসিকতা বুঝতে পারছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর কথায় ভাসানী উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

ঠিক কইছেন। বল বল নিজের বল, ভাইয়ের বল পিছে। আপনার এই বক্তব্যের সাথে আমি একমত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

আপনি উপদেষ্টা পরিষদের মিটিং এ যান। বাংলাদেশ সরকারকে দেশের অভ্যন্তরে গেরিলা যুদ্ধের গতি ও তীব্রতা বাড়াতে সাহায্য করুন। বিশ্বজনমত দেখুক বাংলাদেশের মানুষ আজাদীর লড়াইয়ে দলমত নির্বিশেষে একাট্টা। তাতে বিশ্বজনমত সৃষ্টিতেও সাহায্য হবে। আমরা বিশ্বজনমত সৃষ্টির চেষ্টা করছি। যাতে আপনাদের স্বাধীনতা লড়াইয়ের পক্ষে চারিদিক থেকে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং সময়মত আমরা স্বীকৃতি দিতে পারি।

মাওলানা ভাসানী আর কথা বাড়ালেন না। তবে উপদেষ্টা পরিষদের পরবর্তী মিটিং এ যাবেন বলে স্বীকার করলেন। অন্যান্য প্রসঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বললেন।

তিনি কথা তুললেন চীন ভারতের মৈত্রী প্রসঙ্গে,বললেন দুনিয়ার দুটি সব চাইতে বড় দেশের বন্ধুত্ব সৃষ্টিতে তিনি সহায়তা করতে পারলে, নিজেকে ধন্য মনে করবেন। এই বন্ধুত্বের ফসল ফলবে এশিয়ার নিপীড়িত মানুষের মুক্তিতে। ইন্দিরা গান্ধী নীরব শ্রোতা মাওলানা ভাসানী উচ্ছল বক্তা। ইন্দিরাগান্ধীর যেন কোন বক্তব্য নেই। মাওলানা ভাসানীর বক্তব্যের শেষ নেই।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে মাওলানা ভাসানীর কথোপকথন লেখক সাইফুল ইসলামের "স্বাধীনতা ভাসানী ভারত" গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।

অষ্টম পর্ব

মাওলানা ভাসানী কলকাতায় জনাব তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে রুদ্ধদ্বার কক্ষে আলোচনার পরে বলেছিলেন-

কে যে স্বাধীনতাযোদ্ধা, আর কে যে গাদ্দার, তা বুঝাই ভার। মুজিবুর থাকলে এমন হইত না। এককালীন সেক্রেটারি মুজিবের প্রতি মাওলানা ভাসানীর স্নেহাশীষ শত বিরোধেও বিদ্যমান। আপনি পল্টনে স্বাধীন পূর্ববঙ্গের শ্লোগান তুলে স্বাধীনতা সংগ্রামকে এগিয়ে দিয়েছেন এতে কোন সন্দেহ নেই। এটাই ছিল সময়োচিত শ্লোগান। তিনি পাঞ্জাবির পকেট হতে হাতে লেখা একটি চিঠি বের করে দিয়ে বললেন, 'রাইত জাইগা লেখছি। তুমি ইংরাজি তরজমা কইরা ফেল। আমাকে পইড়া শোনাইয়া সই নিয়া ইন্দিরা গান্ধীর কাছে পাঠাইয়া দিও। খসরাটা পড়ে বললাম, হুজুর এ চিঠি কি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পাঠানো ঠিক হবে?

তরজমা করতো তারপর বোঝা যাইব। মাওলানা সাহেবের নিজ হাতের লেখা চিঠিটার বিস্তারিত কথাই এখানে তুলে দিলাম-

প্রিয় শ্রীমতি ইন্দিরা দেবী,
প্রধানমন্ত্রী।

আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও ভালোবাসা জানিবেন। আমার পত্রের উত্তর মি. কলের (কাউল) মেসেজে বিস্তারিত অবগত হইয়া যারপর নাই খুশী হইলাম। আমার বাল্য জীবনের আদর্শ ৮৯ বছর যাবত অটুট রাখিয়াছিলাম। স্বৈরাচারী ইয়াহিয়া সরকারের অমানুষিক অত্যাচারে উহা লংঘন করিতে হইল। বর্তমানের রাজনীতিবিদ কংগ্রেসের কর্মীদিগকে যে যাহাই বলুক, কিন্তু তাহাদের মত বিলাসিতা শূন্য জীবন যাপন ও নির্মল চরিত্র অনেকেরই নাই। আমি চিরদিন সাধারণ গৃহে সাধারণ ভাবে নির্জন পল্লীতে থাকিয়া দেশের সেবা করিয়াছি। কিন্তু এবারই তাহার ব্যতিক্রম হইল। গত সাত মাস শহরে প্যালেসে, সার্কিট হাউসে বাস, আহারাদি বিলাসপূর্ণ। তাই আমার মৃত্যুকাল

পর্যন্ত যাহাতে বাল্য জীবনের আদর্শ বহাল থাকে তারই জন্য ৫ একর জমি ও সাধারণ ধরনের ৪ খানা ঘরের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। আমার প্রথম পুত্রের মৃত্যু হয় ধুবড়ির গ্রামে। তাই আমার বৃদ্ধাস্ত্রীর আশা তাহার শেষ দাফন ধুবড়ির কোন গ্রামে হয়। আমার শেষ সংগ্রাম বাংলাদেশকে স্বাধীন করা, সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা করা এবং ভারতের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা। এই তিন কাজের সাধন ইনশাআল্লাহ আমার জীবিতকালে দেখার প্রবল ইচ্ছা অন্তরে পোষণ করি।

বাধা যতই আসুক, আমার আন্তরিক আশা ও বিশ্বাস আপনাদের আশীর্বাদে অবশ্যই পূর্ণ হইবে। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ আপনার আদর্শানুযায়ী সমাজতন্ত্র শুধু ভারতে নহে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হইবে। যখন দরকার মনে করেন দিল্লিতে ডাকিলেই হাজির হইব।
ইতি-

ভাসানী দেরাদুনে থাকাকালীন বোম্বে থেকে এক সিনেমার দল এসে ভাসানীর অনেক ছবি তুললেন তাঁর ইন্টারভিউ নিলেন। সেই সময় তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। পেটে প্রচণ্ড ব্যথাসহ কালো পায়খানা হতে থাকে। সিভিল সার্জন এসে ক্যাপসুল খাওয়ালেন, ইন্‌জেকশন দিলেন। রাতে সাইফুল ইসলাম তাঁর পাশে বসে রইলেন আর ভাসানীর দুই স্থানীয় নাতনী জয়া ও ফাত্তাহও রইলেন। ফাত্তাহ নার্সিং এ ক্যাপটেন, সুতরাং সেবাশুশ্রূষার কোন ত্রুটি নেই। সকালে আবার সিভিল সার্জন এলেন এবং স্যালাইন দিলেন। কিন্তু তেমন উপকার হলো না। বরং দিন শেষে রাতে তিনি কেমন নেতিয়ে পড়লেন। আমি খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম। আমি তাঁর দায়িত্বে আছি। রাত পোহালে চরম শঙ্কা নিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ও ন্যাপ দলীয় প্রধান মোজাফফর আহমদকে টেলিগ্রাম করলাম।
সংবাদ পেয়ে সিনহা সাহেব এসেছেন। ব্রিগেডিয়ার লভরাজ তাঁর সকল প্রোগ্রাম বাতিল করে দিয়েছেন। সবাই উদ্বিগ্ন। সিভিল সার্জনসহ ডাক্তারদের একটা বোর্ড গঠন করা হয়েছে। তাদের চিকিৎসায়ও কোন উন্নতি না হওয়ায় সিনহা সাহেব দিল্লিতে মেসেজ পাঠালেন এবং পরের দিন দিল্লি থেকে হেলিকপ্টারে দুজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এলেন। তাঁরা মাওলানা সাহেবকে দিল্লি নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। বিশেষজ্ঞরা যে ওষুধ দিলেন তা ভারতে পাওয়া যায় না। জেনেভা থেকে প্লেনে ওষুধ আনার ব্যবস্থা করা হলো।
অবচেতন অবস্থায় মাওলানা সাহেব স্ট্রেচারে শুইয়ে এ্যাম্বুলেন্সে হেলিপোর্টে আনা হলো। দুপাশে দুজন জয়া আর ফাত্তাহ। ওদের সেবার তুলনা হয় না। স্ট্রেচার ধরেই মাওলানা সাহেবকে হেলিকপ্টারে উঠানো হচ্ছে। সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সিনহা সাহেব, লভরাজ, মি. শর্মা, সিভিল সার্জন, বোর্ডের ডাক্তার নার্স আরও অনেকে। মাওলানা সাহেবের পি. এ. সাইফুল ইসলাম হেলিকপ্টারে উঠলেই সেটি দিল্লির পথে রওনা হয়ে গেল।

নবম পর্ব

আবার সেই ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্স সংলগ্ন হাসপাতালের কেবিন। ডা. ট্যাণ্ডনই চিকিৎসক। বসে রয়েছি অর্ধচেতন মাওলানা সাহেবের পাশে। দিল্লির পোস এলাকা হাউসখৌসের একটি বাড়ির দো তলায় আমাক নিয়ে যাওয়া হলো। এটাই এখন আমার বাসস্থান।

রাতে ভালো ঘুম হলো না। ভোরে চা নাস্তা খেয়ে হাসপাতালে গেলাম। গিয়ে দেখি, মাওলানা সাহেব অসাড়ে পড়ে আছেন, অচেতন।

ডা. ট্যাণ্ডন এলে পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। বৃদ্ধ অভিজ্ঞ চিকিৎসক আমি কিছু বলার আগেই আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন-

মি. ইসলাম আপনাদের মনের অবস্থা উপলব্ধি করতে পারছি। মাওলানা ভাসানীর জীবন আপনাদের জাতীয় জীবনে অসীম গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে এই সন্ধিক্ষণে। আর একটু পরেই স্পেসিফিক মেডিসিন এসে যাচ্ছে। উনি নিশ্চয়ই ভালো হয়ে যাবেন।

শহীদ বরকতের সমাধির পাশে মওলানা ভাসানী

জ্ঞানবৃদ্ধ চিকিৎসকের নিশ্চয়তায় মনে একটা আশ্বাস উঁকিঝুঁকি মারতে লাগলো। ভাসানী ক্রমশ ভালো হতে লাগলেন। জেনেভা থেকে আনা ঔষধ ভালো কাজ করলো। হাসি ফুটলো সবার মুখে। দুদিন পরে সকালে কেবিনে গিয়ে দেখি পান্ডুর চেহারা নিয়ে তিনি বিছানায় বসে আছেন। আমাকে দেখে অতি দুর্বল কণ্ঠে বললেন-

আসছো, পাশে আইসা বইসো।

বিছানাতেই বসলাম। একটা হাত তুলে আঙুলগুলো টেনে দিতে লাগলাম। জীবন এমনই, বার বার ফিরে আসে জন্মের ঋণ শোধ করবার তাগিদে। প্রতিদিন সকাল বিকেল হাসপাতালে যাওয়াই আমাদের এখনকার রুটিন।

সংগৃহীত খবর কিছু থাকলে বলি, সময় সময় খবরের কাগজ পড়ে শোনাই। তিনি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গেরিলাদের লড়াই, সীমান্তের অবস্থা ও কলকাতার কর্মতৎপরতা বিদেশি শত্রুমিত্রের পায়তারা জানার জন্য সব সময় উদগ্রীব হয়ে থাকেন, প্রায়ই বলেন, থাকার কথা লড়াইয়ের সীমান্তে না হয়

লন্ডনে, থাকলাম দেরাদুনে আর দিল্লির হাসপাতালে।

নানা মহলের কথাবার্তা, দেশি-বিদেশি সংবাদপত্রের সংবাদ পরিবেশন, স্বাধীন বাংলা, ভারত পাকিস্তান ও বিবিসির সংবাদ থেকে আমরা অনুমান করতে পারছিলাম সময় ঘনিয়ে আসছে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে যে নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করেছিল, অক্টোবর হতে তা ধীরে ধীরে ফসকে যাচ্ছে। মুক্তি বাহিনীর নামে তখন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আতঙ্কিত। আগস্ট হতেই পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ লাগানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। জেনারেল নিয়াজী ৭ই অক্টোবর ঘোষণা দিলেন জঙ্গ ভারতের মাটিতেই সংঘটিত হবে। এক অঘোষিত যুদ্ধেও পায়তারা ও মহড়া আমরা টের পেতে লাগলাম। একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে মাওলানা সাহেব বললেন, পাক-ভারত যুদ্ধ লাগলে যদি বাইরের শক্তি জড়িয়ে না পড়ে তাহলে বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। কিন্তু মানুষের মুক্তি আসবে না। বললাম-পাক ভারত যুদ্ধ লাগলে চীন পাকিস্তানকে দেওয়া তার ওয়াদা ভুলে কি চুপচাপ বসে থাকবে? উত্তরে ভাসানী বললেন, থাকতেও পারে।

মাওলানা সাহেবের এমন অনুমান চীনের প্রতি দুর্বলতার প্রতিক। সে যাক, মে মাস হতে লক্ষ্য করা গেল চীন যেন কেমন চুপচাপ হয়ে গেল। মনে হলো মাওলানা ভাসানীর অনুমানই ঠিক।
কিন্তু নভেম্বরের দিকে সে চিন্তা ভুল প্রমাণিত হলো। চীন পাকিস্তানের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এক সামরিক মিশনকে দাওয়াত করেছে বলে আমরা জানতে পারলাম। ফলে মন জুড়ে একটা গভীর আশংকার জন্ম হল। ভারত পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ লেগে যায় কিনা সেই আশংকা ঘনীভূত হলো। অপরদিকে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের সরকারি দল আওয়ামী লীগের অন্যতম শক্তি ছিল তার জাতীয়তাবাদী শ্লোগান "জয়বাংলা"। অন্যদিকে স্বাধীনতা যুদ্ধের সূর্যসেনা শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন পাকিস্তানের কারাগারে। ইয়াহিয়া খান তাঁকে বার বার হত্যার হুমকি দিচ্ছিলেন। জীবিত শেখ মুজিব বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের এক বড় শক্তি। যুদ্ধ কাউন্সিল গঠনের প্রশ্নে এক পর্যায়ে সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানী পদত্যাগ করেন। পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ ব্যক্তিগত প্রচেস্টায় স্বাধীনতা যুদ্ধে উৎসর্গকৃত প্রাণ অভিমানী জেনারেলের পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করাতে সমর্থ হন। অন্যপক্ষে শরনার্থী সমস্যা ভারত ও বাংলাদেশ সরকারকে গভীর চিন্তা ভাবনায় ফেলে দিয়েছিল। এমন পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে একদিন মাওলানা ভাসানী বললেন, পাকিস্তানের সরাবীরা নিজেরাই ভাইঙ্গা দিছে। বিশেষ কইরা ভুট্টো। ভুট্টো ভেঙে দিয়েছেন, কেমন হুজুর? ভোটে পাকিস্তানে ভুট্টোর পাল্লাভারী না? দারুণ ভারী।

FRATERNAL DELEGATES FROM PAKISTAN: Three visitors out of the ordinary on their way to the Conference Hall in Scarborough. They are, from left, Dr. T. Badu, Mr. Moulana Bhasani and Mr. M. Hussein. Also attending the Conference was Herr Ollenhauer, who is leader of the German Opposition.

ইতিমধ্যে রুশ- ভারত মৈত্রী চুক্তি হয়েছে। রুশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি সম্পর্কে মাওলানা সাহেব সরাসরি কোন মন্তব্য না করে বললেন, একটা নয়া পরিস্থিতির সৃষ্টি হইলো, দেখ মার্কিনেরা আবার কি নয়া খেল শুরু করে?

দশম পর্ব

অন্যদিকে ইন্দো- রুশ চুক্তির পর মুজিবনগর সরকার ও স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তিগুলোর মধ্যে চলছিল ইতিবাচক কার্যক্রম। স্বাধীনতা সংগ্রামকে আরও সুসংহত ও বেগবান করার লক্ষ্যে কলকাতা হাজরা স্ট্রীটের একটা বাড়িতে বৈঠক বসে। মাওলানা ভাসানীকে চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীনকে আহ্বায়ক নির্বাচিত করে সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটিকে বাস্তবপন্থী করে তোলা হয়।

এমন প্রচেস্টায় ভারত সরকারের তাগিদ ছিল। ফলে একটা সুষ্ঠু সমন্বয়ে দেশের অভ্যন্তরে গেরিলা যুদ্ধ অধিকতর সংহত ও বেগবান হয়ে উঠে। বৈঠক শেষে হয় মাওলানা ভাসানীর মনে ঘটমান ঘটনার একটা বিশ্লেষণ তৈরী হয়েই থাকতো। মাওলানা সাহেবের ব্যাখ্যা শুনে বললাম, -হুজুর পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হলে আমাদের আর কিছুই করার থাকবে না।

হ্যা উপদেষ্টা পরিষদ এমনিতেই নিস্কর্মা ছিল, যুদ্ধ শুরু হইলে আরও ফালতু হইয়া যাইবো। আমাদের কাম শুধু চাইয়া চাইয়া দেখা আর ফলাফল এর জন্য অপেক্ষা করা।

এই অবস্থায় মাওলানা সাহেবের ব্যক্তিগত সচিবের আর তেমন প্রয়োজন নেই। সময় টা ছিল নভেম্বরের মাঝামাঝি। ইতোমধ্যে ইদুল- ফিতর এসে গেল। মাওলানা সাহেব দিল্লির বাদশাহী মসজিদের বিশাল ঈদের জমায়েতে নামাজ আদায় করলেন। পরদিন দিল্লির বিভিন্ন পত্রিকায় ছবি ছাপা হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূত মাওলানা ভাসানী ঈদের জমায়েতে নামাজে সামিল হয়েছেন, মুনাজাত করছেন, নামাজ শেষে কোলাকুলি করছেন।

মাওলানা সাহেবের মুখে আবার হাসি ফিরে এসেছে। দেরাদূনের দিনগুলো ছিল বৃহত্তর একটা কিছু করবার বা হবার আশান্বিত অপেক্ষা, তা ধুলিস্যাৎ। করতে এলাম মুক্তিযুদ্ধ হয়ে গেলাম মেহমান। আর নয়। ঈদের পরের দিন আলাপ প্রসংগে বললাম-

- হুজুর যুদ্ধ একটা লাগবেই।
- হ, তাই মনে হইতাছে ।

পাক-ভারতের যুদ্ধ শুরু হলে আমরা যারা সীমান্ত অতিক্রম করে এসেছি তাদের জারিজুরি শেষ। যা করবার তা করবে ভারত আর পাকিস্তান সরকার। আমরা শুধু ভারত সরকারের দাওয়াত খেয়েই স্বাধীনতা সংগ্রামের দায়িত্ব

খতম করলাম। দাওয়াত খাওয়ার পালা শেষ করতে চাই হুজুর। ফিরা যাইবার চাও ?

আপনি যদি অনুমতি দেন।

কোথায় যাইবা?

আপাতত কলকাতা গিয়ে পার্টি অফিসে হাজিরা দেব। মাওলানা সাহেব কথা না বলে শুধু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার পরে বললেন, লভরাজ আর জয়া -ফাত্তাহকে চিঠি দাও, আমি সুস্থ হইয়া উঠছি। হুজুর তিনদিন আগে টেলিগ্রাম করে দিয়েছি।

শুনে মাওলানা সাহেব একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন-

জাত আর ধর্মের বালাই নাই, মানুষই মানুষের দুষমন আর মানুষই মানুষের আপনজন। কোথাকার কেডা আপন হইয়া গেল। তাদের ঠিকানা আছে তোমার কাছে?

-জি আছে।

-ঠিকানাগুলা আমাকে দিও ।

এক সপ্তাহ পরে তিনি আমাকে কলকাতা যাওয়ার অনুমতি দিলেন এবং যাবার প্রস্তুতি নিতে বললেন। কথা বাড়ালাম না। ঘটনা প্রবাহে এটা স্পষ্টই বুঝতে পারছিলাম আমাকে আর মাওলানা সাহেবের প্রয়োজন হবে না। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে আমি মাওলানা সাহেবকে ছেড়ে কলকাতায় চলে এলাম। পরের দিন মাইনকারচরে দৌড়ালাম।

৩রা ডিসেম্বর পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল ৬ ডিসেম্বর ভারত সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলেন। পাক-ভারত যুদ্ধকালীন অবস্থায় প্রথমদিকে মাওলানা ভাসানী দিল্লির হাসপাতালেই ছিলেন। তখন মাওলানা সাহেব আশঙ্কা প্রকাশ করতেন, চীন হয়তো সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পরতে পারে। চীনা বোমা দিল্লিতে পড়তে পারে।

যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যেই মাওলানা ভাসানী হাসপাতাল ছেড়ে এসে উঠলেন, যমুনার তীরবর্তী এক বাংলোতে। দেশে ফেরা পর্যন্ত তিনি ঐ বাংলোতেই ছিলেন।

একাদশ পর্ব

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের নবম দিন। পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তের দুই ফ্রন্টেই চলছে। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের তুমুল যুদ্ধ। মাওলানা ভাসানী নয়াদিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্সেসের ভি আই পি কেবিনে শায়িত। ফজরের নামাজ আদায় করে তিনি শুয়ে শুয়ে নীরবে দোয়া দরুদ পাঠ করছেন। সকালে কর্তব্যরত ডাক্তার ও নার্স এসে তাঁদের রুটিন মাফিক দায়িত্ব পালন করে গেছেন। ব্রেকফাস্টের পরে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আসার কথা। সেদিন এর ব্যতিক্রম ঘটল। মাওলানার কেবিনে ঢুকলেন দুজন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বিশেষ দূত টি এন কাউল এবং হাসপাতালের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। তিনি এসেছেন হাসপাতালের পরিচালক প্রফেসর ভি রামলিঙ্গ স্বামীর পক্ষ থেকে। তাঁদের পেছনে দুই

কর্মকর্তার হাতে ফুলের তোড়া ও মিস্টান্নের বাক্স। টি এন কাউলের হাতে একটি সুন্দর ছড়ি। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে মাওলানা ভাসানীকে জন্মদিনের উপহার। ভারত সরকারের সর্বশেষ নথিতে এবং তাঁর পাসপোর্ট অনুযায়ী মাওলানার জন্ম তারিখ ১২. ১২.১৮৮০।

তাঁদের দেখে মাওলানা ভাসানী তাঁর বিছানায় উঠে বসেন। তাঁরা তাঁকে ভারতীয় রীতিতে জোড়হাতে নমস্কার জানান। মাওলানা তাঁদের অভিবাদনের জবাব দেন এক হাত উঁচিয়ে। ভাসানী তাঁদের অত সকালে দেখে তাজ্জব বনে যান। ব্যাপার কি? যুদ্ধ চলছে দুই দেশের মধ্যে। বাংলাদেশের মুক্তিসেনারা ও সাধারণ মানুষ জীবন মরণ লড়াই করছেন দেশকে শত্রমুক্ত করতে। তাহলে কি যুদ্ধে ভারত জিতে গেছে? বাংলাদেশ কি এখন পাকিস্তানি হানাদারমুক্ত? বাংলাদেশ কি স্বাধীন ? এসব প্রশ্ন তাঁর মনে উঠে। মাওলানা জানতেন না যে আজই তাঁর জন্মদিন। তাঁর শয্যার পাশে দুই অতিথি চেয়ার টেনে বসেন।

কাউল জানতে চান, মাওলানা সাহেব কেমন বোধ করছেন এখন?

ভাসানী উত্তরে বলেন, ভালো, কিন্তু খবর কি?

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে ফুলের তোড়া, একটি

জন্মদিনের কার্ড এবং একটি ছড়ি। কার্ডটির আকার ৫' × ৪'। ওপরে লাল জবাফুলের ছবি।

মিস্টির প্যাকেট ও ফুলের তোড়া টেবিলে রেখে লোকটি চলে যান। ছড়িটি মাওলানার হাতে তুলে দিয়ে কাউল বলেন, প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে আপনাকে জন্মদিনের সামান্য উপহার।

ভাসানী মুগ্ধ হন। হিন্দিতে বলেন, তা তো তিনি পাঠাবেনই। ইন্দিরা জওহরলাল নেহেরুর মেয়ে না ? পন্ডিত মতিলাল নেহেরুর নাতনী তো! আমরা একসময় একই সঙ্গে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। এখনো আবার একই সঙ্গে লড়ছি এক বর্বর জালেমের বিরুদ্ধে।

ভাসানী মতিলাল নেহেরুর অসাম্প্রদায়িক নীতির বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বলতেন, তাঁর মতো উদার নেতা কংগ্রেসে বেশি থাকলে ভারতবর্ষ ভাগ হতো না। জওহরলাল নেহেরুর নন-অ্যালানিড পলিসিরও ভাসানী ছিলেন অবিচল সমর্থক।

ড. রামলিঙ্গ স্বামীর পক্ষ থেকে মাওলানাকে উপহার তুলে দেন হাসপাতালের কর্মকর্তা। সেই সঙ্গে হাসপাতালের প্যাডে একটি জন্মদিনের শুভেচ্ছাপত্র দেন। মাওলানার সঙ্গে কয়েক মিনিট কাটিয়ে হাসপাতালের কর্মকর্তা চলে যান। কেবিনে থাকেন শুধু ভাসানী ও কাউল। তাঁদের মধ্যে সেদিন যুদ্ধ পরিস্থিতি, মুজিবের বর্তমান অবস্থান ও তাঁর মুক্তি ও বাংলাদেশের ভবিষ্যত নিয়ে কথাবার্তা হয়।

ভারত সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন কাউল।

হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স, আয়া, বয়দের ডেকে মাওলানা মিষ্টিগুলো তাদের মধ্যে বিলিয়ে দেন। ছড়িটি তিনি ব্যবহার করেছেন এবং দেশে নিয়ে এসেছিলেন।

মাওলানা ভাসানীর যে জটিল অসুখ হয়েছিল। তা বড় বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের চিকিৎসায় ভালো হয়ে যায়। ১৬ ডিসেম্বরের পরে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় যমুনা তীরের এক বাংলোতে। সেখানে তিনি বেশ কিছুদিন থাকেন। পত্র পত্রিকা পড়ে তাঁর সময় কাটত। একদিন রাজঘাটে গিয়ে মহাত্মা গান্ধীর সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আসেন।

শুনেছেন পাকিস্তানের পতন হয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর উদ্বেগ ছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ- পরবর্তী বাস্তবতা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করার কেউ ছিলেন না । ভারত সরকারের কর্মকর্তাদের সঙ্গেই শুধু তাঁর কথা হতো। তাঁরা খবরের কাগজের প্রতিবেদনের বাইরে বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতেন না। তিনি দেশে ফেরার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন।

দ্বাদশ পর্ব

মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে মাওলানা ভাসানীর বেশ কয়েকটি বড় বিবৃতি প্রচারপত্র আকারে মুদ্রিত করে বাংলাদেশের ভেতরে এবং পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম প্রভৃতি বাঙালি--অধ্যুষিত অঞ্চলে বিলি করা হয়েছিল। মাওলানা ভাসানীর জ্যেষ্ঠ পুত্র আবু নাসের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন। আগস্ট মাস থেকে চেষ্টা চলছিল, কিন্তু অর্থাভাবে বিলম্ব হয়। ভাসানীর ভক্তরা টাকার যোগার করলে নভেম্বরের ১ তারিখে ন্যাপের মুখপত্র হিসেবে গণমুক্তি নামে একটি সাপ্তাহিক আত্মপ্রকাশ করে।
এটির শীর্ষে লেখা থাকতো "প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ভাসানী" ঢাকার টিপু সুলতান রোডের ঠিকানা থাকলেও গণমুক্তি প্রকাশিত হতো প্রাচ্যভারতী রোড, বালুরঘাট থেকে। এটির সম্পাদিকা হিসেবে আবু নাসেরের স্ত্রী পারভীন খানের নাম থাকলেও সম্পাদনার মূল দায়িত্ব পালন করতেন রাধামোহন মোহান্ত নামের একজন ভারতীয় বাঙালি।

ট্যাবলয়েড আকারের চার পৃষ্ঠার গণমুক্তির প্রথম সংখ্যার লিড সংবাদটি ভাসানীর ব্রিফ বা ডিকটেশন অনুসারেই লেখা হয়েছিল। ভাষ্যটি ছিল এরকম--পাকিস্তানের জঙ্গিনায়ক ইয়াহিয়া খান বাংলাদেশের নেতাদের ধোঁকা দিয়ে ৬-দফা দাবির ভিত্তিতে প্রকাশ্যে ঢাকায় আলোচনা শুরু কও়ে, তলে তলে বাঙালি জাতিকে পিষে মারার প্রস্তুতি চালায় এবং সেই গোপন সামরিক প্রস্তুতি শেষে আলোচনা সভা বাতিল করে দিয়ে ঢাকা এবং পূর্ব বাংলার সর্বত্র সামরিক বাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যাকাণ্ড নিরস্ত্র বাঙালি জাতির উপর চালাতে থাকে, ঠিক সেই দিনই বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের শবদেহের পাহাড়ের নীচে পাকিস্তানের কবর রচিত হয়েছে।
সুতরাং আজ যারা রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলেন, তাদের আমরা জানিয়ে

দিতে চাই যে সার্বভৌম স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক বাংলাদেশের স্বীকৃতিই

রাজনৈতিক সমাধানের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ ভিত্তি। আর অন্য কোন শর্তের ফন্দিফিকির চলবে না।

আজ যদি জঙ্গিনায়ক ইয়াহিয়া খান তার পশ্চিমী বন্ধুগণের প্ররোচনায় বাংলাদেশ সমস্যা "পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার" অজুহাতে ভারতকে আক্রমণ করে বসে তবে তার " পশ্চিম পাকিস্তানেরও কবর " রচিত হবে। হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে বাংলাদেশের এককোটি অধিবাসীকে ভারতে ঠেলে দিয়ে আন্তর্জাতিক আইনের অনুশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে, "বাংলাদেশ সমস্যা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার" একথা ইয়াহিয়ার মত জল্লাদ ছাড়া আর কেউ সমর্থন করবে না।
উল্লেখ্য যে আওয়ামী লীগের ভেতরের একটি অংশ পাকিস্তানের সঙ্গে একটি রাজনৈতিক সমঝোতায় আসার চেষ্টা করছিল। ভারত সরকারের তা অজ্ঞাত ছিলো না। ভাসানীর অনুসারীরা সেই অপচেষ্টার তীব্র বিরোধিতা করেন। ভাসানীও আপসকামীদের 'মীরজাফর' আখ্যায়িত করে তাদের তৎপরতার বিরুদ্ধে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

প্রথম সংখ্যার ছোট সম্পাদকীয়টি ছিল এরকম, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের আজ আট মাস। বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে বাঙালি মুক্তির সংগ্রাম। আজ প্রতিটি বাঙালির মুখে একই কথার প্রতিধ্বনি, "হয় মৃত্যু, নয় মুক্তি" অর্থাৎ আপোষহীন সংগ্রামই বাঙালি জাতির অস্তিত্ব রক্ষার একমাত্র পথ।

কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, আজ কোনো কোনো মহল বাঙালি জাতির এই অভিমতকে উপেক্ষা করে তথাকথিত রাজনৈতিক সমাধানের জন্য বেশ উঠে পড়ে লেগেছেন। কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে একটা সাধারণ প্রশ্ন উঠতে পারে, রাজনৈতিক সমাধানটা কেন ? আর কার সঙ্গে ? যাদের অস্বীকার করে যাদের হাত থেকে মুক্তি পাবার স্বাধীন বাংলা ঘোষণা করেছি, সশস্ত্র সংগ্রামে জনতাকে উদ্বুদ্ধ করেছি তাদের সাথে আপোস! এ কেমন কথা ?
যেখানে লক্ষ লক্ষ মুক্তিকামীর শবদেহের নিচে পাকিস্তানের কবর রচিত হয়েছে, সেখানে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অস্তিত্ব স্বীকার ব্যতীত কোনরূপ আপোস হতে পারে না।

গণমুক্তির কয়কটি সংখ্যা প্রকাশের পরই ১৬ ডিসেম্বর'৭১ হানাদার বাহিনী ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ভারতীয় মিত্রবাহিনী ও বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন কওে, অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন বাংলাদেশের।
মুক্তিযুদ্ধে ভাসানী ন্যাপের অসংখ্য নেতা- কর্মী শহীদ হন। ভাসানীর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ন্যাপের কোষাধ্যক্ষ সাইদুল হাসানকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার তিন মাসের মধ্যে হত্যা করা হয়।

ত্রয়োদশ পর্ব
স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ১২ দিন পরে যখন ঢাকার পত্র পত্রিকায় মাওলানা ভাসানীকে নিয়ে লেখালেখি শুরু হয়েছে, তখন প্রধানমন্ত্রীর আগ্রহে এবং উদ্যোগেই ভারত সরকার ভাসানীর দেশে ফিরে আসার ব্যবস্থা করে। তখন মাওলানা সাহেবের স্বাস্থ্য বিশেষ ভালো ছিল না। ডিসেম্বর যুদ্ধের কয়েক দিন আগে থেকেই তিনি দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্স হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।
দিল্লি থেকে দেশে ফেরার আগে তিনি আসাম যান। সেখানে তাঁর পরিচিতজনের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চেয়েছিলেন ভারত সরকারের কাছে। ভারত সরকার তাতে সম্মতি দেয়। জানুয়ারির শেষ দিকে তিনি আসামের ফরিদগঞ্জে এক জনসভায় ভাষণ দেন । সেখানে তিনি
বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরেন। সেই সঙ্গে পাকিস্তানি বর্বরতা ও ২৩ বছরের শোষণের বিবরণ দেন।

এদিকে পাকিস্তান থেকে ফিরে ১০ জানুয়ারি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শেখ মুজিব তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন, আসার আগে ভুট্টো সাহেব আমাকে বলেছিলেন, শেখ সাহেব, দুই দেশের মধ্যে যদি কোনো রকম বাঁধন রাখা সম্ভব হয়, তাহলে ভালো হয়। আমি বললাম, ভুট্টো
সাহেব, তোমরা সুখে থাকো। কিন্তু বাঁধন টুটে গেছে, আর না।
ভাসানীও ফরিদগঞ্জের সভায় একই কথা বললেন। পাকিস্তানের সাথে আর কোনো বাঁধন নয়। পাকিস্তানিদের অত্যাচারের কথা বাংলাদেশের মানুষ কোন দিন ভুলবে না। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর দলের এবং অন্যান্য ভারতীয়দের অবদানের কথা স্মরণ করে তাঁদের প্রতিও শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে মাওলানা বলেন, বাংলাদেশের জনগণ এই হৃদয়বান মহিলার কথা ভারতের জনগণের সাহায্য সহযোগিতার কোন দিন ভুলবে না। ভারতের মতো বাংলাদেশও ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দেশ হয়ে বিশ্বসভায় স্থান করে নেবে বলে আমি বিশ্বাস করি।
২১ জানুয়ারি মেঘালয় থেকে মাওলানা ভাসানী ভারত সরকারের একটি জিপে চড়ে বাংলাদেশের হালুয়াঘাটে পৌঁছান।তাঁর সঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন চিকিৎসক ছিলেন। হালুয়াঘাটে তাঁকে মামুলি অভ্যর্থনা জানান ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসক খসরুজ্জমান চৌধুরী, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাকর্মী ও তাঁর ভক্তমন্ডলী।

সড়কপথে শ্রান্ত- ক্লান্ত দেহে ১২ জানুয়ারি শেষ রাতে তিনি টাঙ্গাইলে পৌঁছান।

রাতে সার্কিট হাউসেই থাকেন। কারণ, মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই পাকিস্তানি

সেনারা তাঁর সন্তোষের বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল।

পরদিন সকালে মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা, স্থানীয় আওয়ামী লীগ, ন্যাপসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতা- কর্মীরা তাঁকে দেখতে সার্কিট হাউসে সমবেত হন।

প্রায় দশমাস পরে সহকর্মী ও পরিচিতজনদের সঙ্গে দেখা হওয়ায় উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন মাওলানা ভাসানী। পকেট থেকে দশ টাকা বের করে একজনকে দিয়ে বললেন, সন্দেশ নিয়া আইসো। ঐ দশ টাকার সঙ্গে আরও টাকা যোগ করে আনা হলো সন্দেশ। সবাইকেই মিষ্টিমুখ করালেন তিনি। ভারত সরকার তাঁর হাত খরচের জন্য কিছু টাকা দিয়েছিল।

দেখত দেখতে অসংখ্য লোক জড়ো হয়ে গেল। ফুটপাতের এক দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সমবেত জনগণের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার, যারা এখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, একটি বৈধ সরকার। দেশ গঠনের কাজে এই সরকারকে সমর্থন দেওয়ার জন্য তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান।

টাঙ্গাইল থেকে তিনি সন্তোষ যান। তাঁর পোড়া ভিটেয় গিয়ে ঘুরে ঘুরে সবকিছু দেখেন। তাঁর যেসব প্রিয় জিনিস খোয়া গেছে সেগুলোর জন্য আফসোস করেন। তাঁর চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস গোপন থাকে না উপস্থিত দর্শনার্থীদের কাছে। দলে দলে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে ভক্তরা এসে পা ছুঁয়ে সালাম করতে লাগল তাদেও, প্রিয় হুজুর বা পীরবাবাকে। এলাকার কে কোথায় মারা গেছে, ক্ষতিগ্রস্ত
হয়েছে বা কেমন আছে, সব খবর নিলেন তিনি। ঘনিষ্ঠ কারও কারও নিহত হওয়ার কথা শুনে তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত ও কণ্ঠ বাকরুদ্ধ হয়ে উঠলো।

সন্তোষ জমিদারবাড়ির পুরনো দালানের একটি কক্ষে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা হলো। ভক্তরা যখন কিছুটা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, তখন তিনি নিজেই নির্দেশ দিলেন মেঝেতে নাড়া বা খড় বিছিয়ে তার ওপর একটি খেজুরের পাটি বা চট ও কাঁথা পেতে শয্যা তৈরি করে দিতে। আশেপাশের কারও বাড়ি থেকে জোগাড় হয়েছিল একটি পুরনো কাঁথা। সেরাতে অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লেন মাওলানা। স্বাধীন দেশে দশ মাস পরে ফিরে এসে মাটির শয্যায় প্রথমবার পরম শান্তিতে ঘুমালেন তিনি।